হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা

প্রণেতা

প্রেমযোগ, বিশ্বধর্ম্ম, নবযুগের সাধনা প্রভৃতি

গ্রন্থলেখক

যোগেন্দ্র কুমার সরকার

কবিরত্ন কবিরাজ।

রাজবাড়ী—ফরিদপুর।

প্রকাশক

শ্রীহরেকৃষ্ণ বিশ্বাস।

৮নং কৃপানাথ লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম-সংস্করণ
১৫ই পৌষ
১৩৪০ সন।

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের

পবিত্র কর-কমলে।

দেব !

সম্রাট যে দেবতারে পূজে নানা উপচারে,
দীন তাহে বনফুলে করয়ে অর্চ্চন,
তাই বড় আশা ক'রে এনেছি অর্পিতে করে,
দুর্ব্বাদলে মাখাইয়ে ভকতি-চন্দন।
করুণ-নয়নে চে'য়ে দেবত্বের স্পর্শ দিয়ে,
জগতের অস্পৃশ্যতা করিছ দলন,
এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য মোর মরম-ব্যথায়-ভোর,
পরশে পবিত্র কর ইতি নিবেদন।

গুণ-মুগ্ধ

যোগেন্দ্র কবিরাজ।

১৫ পৌষ,
১৩৪০ সন।

রাজবাড়ী—ফরিদপুর।

হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা লিখিলাম কেন ?

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ও সমাজ সংস্কারের কথা শুনিলেই অনেক শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি পর্য্যন্ত আজিও শিহরিয়া উঠেন! তাঁহারা ঐসবকে সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমাজ সংস্কার-প্রচেষ্টা বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের পক্ষে বাস্তবিকই আবশ্যক কিনা, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য কেহ একটুকুও মাথা ঘামান না। তাই ওসম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে এপর্য্যন্ত কতবার যে ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতীতের প্রান্তভাগে সত্যযুগে যখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু অত্যাচারে ধর্ম্ম-লোপ করিতে বসিয়া ভগবানের নামে পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন, তখন ভক্ত প্রহ্লাদের আবির্ভাবে সেই অধর্ম্মের দলন ও শান্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

ত্রেতাযুগে যখন রাক্ষস-নামধেয় অনার্য্যজাতি অত্যাচারে জন-স্থিতি-ধ্বংস ও সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে বিঘ্ন-উৎপাদন করিতেছিল, যখন অধর্ম্মের স্রোতে অভিভূত হইয়া রাজা—রাজ-ধর্ম্ম, পুত্র—পিতৃ-মাতৃভক্তি, সহোদর—ভ্রাতৃ-বাৎসল্য ও স্ত্রী—পতি-ভক্তি জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল, তখন ভগবান রামচন্দ্র

আবির্ভূত হইয়া অত্যাচারীবৃন্দের দলনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য-পরায়ণ রাজার আদর্শ, পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত পুত্রের আদর্শ, সৌভ্রাত্রের আদর্শ ও পতি-প্রেমের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া যোগ-বাশিষ্ঠ্যে সময়োপযোগী ধর্ম্মনীতি প্রকটিত করতঃ শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অতঃপর দ্বাপরযুগে যখন শিশুপাল, জরাসন্ধ ও কংস প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাগণ অত্যাচারে সমাজ ধ্বংস করিতেছিল, যখন এক জরাসন্ধের কারাগারেই শতাধিক রাজা নরবলির জন্য বন্দী হইয়াছিল! যখন কুরুবংশের ন্যায় শ্রেষ্ঠ রাজবংশও ভীষণ পাপাচারী হইয়া পাশা খেলার কৌশলে স্বীয় বংশেরই কুলবধুকে হস্তগত করতঃ প্রকাশ্য রাজসভার ভিতরে আনিয়া উলঙ্গ করিতেছিল! যখন মূর্ত্তিমান-ধর্ম্ম মহা-প্রাণ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত সমাজের ব্যসনের বাহিরে না থাকিতে পারিয়া স্ত্রীকে পণে আবদ্ধ রাখিয়া পাশা খেলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—যে বীভৎস পাপ-ঘটনা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হয় নাই! এইরূপ কুৎসিত সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া অত্যাচারীবৃন্দের দলন এবং বেদ, পুরাণ ও ষড়-দর্শনের নির্য্যাস-স্বরূপ গীতাধর্ম্ম প্রচার করিয়া শান্তিরাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আবার কলিযুগে যখন হিংসা-দ্বেষ প্রবল হইয়া ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতে আরম্ভ করিল, যখন ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ধর্ম্মধ্বজী-নেতাগণ অবিরত

পশু-হত্যা ও নরবলি দ্বারা পর্য্যন্ত হিংসার পরাকাষ্ঠায় বীভৎস তাণ্ডবের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন মহাপ্রাণ বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া অহিংসা-পরমধর্ম্মের মারফতে নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রচার করতঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজা অশোক ও হর্ষবর্দ্ধনের রাজকীয় প্রচেষ্টায় বুদ্ধদেবের অহিংস-অভেদনীতি ভারতময় প্রচারিত হইয়া ভারতের বাহিরে ব্রহ্ম, চীন ও জাপান প্রভৃতি বহুদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল! বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই প্রবল-প্লাবনে প্রায় সমস্ত হিন্দুই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হিন্দু-ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় হইল!

অতঃপর যখন বুদ্ধের নির্ব্বাণ-মুক্তির সাধনায় গোঁড়ামী প্রবেশ করাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীতে দেশ ছাইয়া গেল, যখন মানুষসব চতুর্ব্বর্গের প্রথম তিনটী বাদ দিয়া শুধু মোক্ষের নিষ্ক্রিয় ভাব-ধারায় ডুবিয়া দেশময় জড়ত্বের সৃষ্টি করিতেছিল, তখন শঙ্করাচার্য্যদেব আবির্ভূত হইয়া বৈদিক-সাধনা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সকলকে ফিরাইয়া আনিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শঙ্করের চেষ্টায় বৌদ্ধের ফেরৎ জন-সঙ্ঘ লইয়া নূতন বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু সমাজে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষি ও ব্রাহ্মণের এমনই অভাব হইয়াছিল যে, ইহার অনেক পরেও আদিশূর যজ্ঞ করিবার জন্য সমস্ত বাঙ্‌লা খুজিয়া ব্রাহ্মণ পাইলেন না! ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের ফলে দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটাতে উপযুক্ত মহাপ্রাণ

নেতার অভাবে শঙ্করের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে গোঁড়ামী ঢুকিয়া আত্মাভিমান ও সঙ্কীর্ণতা প্রবল করতঃ ভেদনীতি ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার সৃষ্টি করিল। ক্রমে ঐ মহাপাপ ও মহাব্যাধি এমনই সংক্রামক হইয়া উঠিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদে সহস্র বৎসর কাল যাঁহাদের জাতিভেদের নামগন্ধ ছিল না, তাঁহারাই এখন আভিজাত্যের মোহে ভেদনীতি ও অস্পৃশ্যতাকে চিরসম্বল করিয়া লইলেন,—যাহার প্রভাব বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছে!

এইরূপেই বৌদ্ধযুগের পর হইতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজ সঙ্কীর্ণতা-প্রভাবে বিপ্লবের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অধঃপতনের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে এর উপরে আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার গোঁড়ামী ও আবিলতায়, এবং আভিজাত্যের পেষণে যখন অশান্তির ঘূর্ণিবাত্যায় সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল, তখন কলি-পাবন অবতার গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া প্রেম-ধর্ম্মের উদার মত প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে মুসলমানকে পর্য্যন্ত আপনার সাম্যমৈত্রীর উদারবুকে ধারণ করিয়া ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব অবসানের মহান্ আদর্শ ও মহাভাব-ধারা প্রকটিত করিয়া শান্তির আবহাওয়া প্রবাহিত করিলেন।

আজ মহাত্মাগান্ধী-প্রমুখ নেতৃ-বৃন্দ ঐ ভাব-ধারাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তিও জগতেরই একটী

ক্ষুদ্রতম পরমাণু এবং হিন্দু-সমাজেরই একজন ক্ষুদ্রতম সেবক বলিয়া ঐ বিপ্লবের অবসান মানসে এই ক্ষুদ্রশক্তি-প্রসূত 'হিন্দুধর্ম্ম ও স্পৃশ্যতা' গ্রন্থ লিখিয়া সমাজ-সেবায় নিয়োগ করতঃ কৃতার্থ হইলাম। উপসংহারে জানাইতেছি যে, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সমাধি-প্রকাশআরণ্য স্বামীজী-মহারাজের অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান ও অকৃত্রিম স্নেহ এই গ্রন্থ-লেখার কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বিনীত গ্রন্থকার।

আমার কৈফিয়ত।

আমাকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অনুকূলে কাজ করিতে দেখিয়া অনেকেই এই বলিয়া কৈফিয়ত তলব করেন যে, নিম্ন-বর্ণকে সমাজে চলকরা উপলক্ষে তোমরা নানা জাতির হাতের জল খাও কেন? এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে হইলে আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়,—

আমি সংযমের পক্ষপাতী, সংযত-ব্যবহারের পক্ষপাতী, সনাতন ধর্ম্মের মূলসূত্র সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা ও সরলতার পক্ষপাতী বলিয়া মিথ্যার আবরণ, গোঁড়ামী ও গোজামিল বাদ দিয়া প্রাণের সরল-সত্য প্রকাশের সঙ্গে এই কৈফিয়ৎ দিতেছি যে, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের ভাব আমার জীবনে নূতন আমদানী নহে। ছোটবেলা হ'তেই সমাজে-প্রচলিত আহার-বিহারের ভিতর দিয়া নিম্নবর্ণের শুধু জলে নয়, অন্নে পর্য্যন্তও যে কিভাবে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি,—যাহার প্রভাবে প্রশ্নকারিগণের অনেকেই

অভিভূত, নিম্নে সে সম্বন্ধে কয়েকটী বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করিতেছি। আশা করি প্রশ্নকারিগণ ঐ সত্যের উপলব্ধি করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

১। আমাদের পুরোহিত ঠাকুর স্বয়ং এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ, 'ভরারমে'য়ে' বিবাহ করাতে ছোটবেলা হ'তেই আমরা ঐ 'ভরারমে'য়ের' হাত দিয়া নানা জাতির অন্ন খাইতে অভ্যাস করিয়াছি। 'ভরারমে'য়ের ইতিহাস' ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। স্থানীয় পূজারী অধিকারী ঠাকুরের হাতে অনেক সময়ই সকলকে খাইতে হইত। এই খাওয়ার ফলে আমরা সকলেই যে প্রকারান্তরে অস্পৃশ্যের হাতে খাইয়াছি, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারি। কেননা কালক্রমে অভ্রান্তভাবে জানা গেল যে, ঐ পূজারী ঠাকুরের জন্ম-রহস্যের মূলে রহিয়াছেন,—"একজন ভেকধারী কাপালীক ব্রাহ্মণ ও একজন নমঃশূদ্রা বৈষ্ণবী!"

৩। বাক্‌চি-বাড়ীর পাচক-ঠাকুর চাকুরী ছাড়িয়া যে জুতা সেলাই করিতেছিলেন,—সকলের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেও যখন স্বচক্ষে সে দৃশ্য দেখিয়াছি, তখন "চর্ম্মকারের হাতে যে সকলেই খাইয়াছি", ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

৪। আমরা স্থানান্তরে যাইয়া কিছু দীর্ঘকাল বাস করাতে তথায় একজন নৈষ্ঠিক পুরোহিতকে দিয়া পূজা-পার্ব্বণ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে জানা গেল ঐ গোঁড়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ

স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে একজন নমঃশূদ্রা-সেবাদাসী রাখিয়া দশকর্ম্ম চালাইয়া লইতেছেন! এই পুরোহিতের হাতেও যখন খাইয়াছি, তখন কোন্ জাতির হাতে খাই নাই পাঠক পাঠিকা বিচার করিবেন।

৫। আমার একজন গোঁড়া-ব্রাহ্মণ বন্ধু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলের বিধবা-বিবাহ-সংস্রবের কন্যা বিবাহ করিয়া বিধবা-বিবাহের ও সমাজ-সংস্কারের বিদ্রোহীভাবে সমাজে বেশ বুক ফুলাইয়া চলিতেছিলেন! এই বন্ধুবরের ঘরেও যখন খাইয়াছি, তখন আমার সমস্ত গোঁড়ামীই যে বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—একথা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর কার্য্য-অনুরোধে কলিকাতা যাইয়া কিছুদিন মে'ছে খাইতে হইয়াছিল। ঐ অন্নচ্ছত্রে ঝি, চাকর ও ঠাকুরের হাতে খাওয়ার ফলে যে এবার পতিত হইতে আরম্ভ করিয়া পতিতা পর্য্যন্ত কাহারও স্পৃশ্য-খাদ্য বাকি রহিল না, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। ইহা ভিন্ন হোটেলের ব্যাপারে দেখিলাম, প্রত্যেকটী হোটেলই মূর্ত্তিমান জগন্নাথক্ষেত্ররূপে সর্ব্ববর্ণের সম্মিলন ঘটাইতেছে! এখানে ধর্ম্ম যাওয়ার ভয় নাই, জাতি যাওয়ার ভয় নাই। কেবা রান্ধে! কেবা দেয়! আর কেবা খায়!! কলিকাতার এই সাম্যনীতি দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম,—ধন্য কলিকাতা! সর্ব্বভুক তুমি যখন পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে তোমার একই জঠরে ফেলিয়া

হজম করিতেছে, তখন তোমার অলিতে গলিতে পূরীর সাম্যনীতির মহিমা ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

. কলিকাতার মেছে ও হোটেলে বহু গোঁড়া—সনাতনীকে সকলের সহিত অবিচারে যার তার হাতে খাইতে দেখিয়া আমার স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার ও খুটিনাটি সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল।*

ভ্রাতৃগণ! আমি যেমন সমাজের গোজামিলের ভিতর দিয়া সর্ব্ববর্ণের স্পৃশ্যখাদ্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, আমার মত প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিলে বোধ হয় আপনারা প্রত্যেকে আমার কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিবেন যে, "আমরা সকলের হাতেই খাই, মূলে অস্পৃশ্যতা কোথাও নাই।"

বিনীত নিবেদক

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরত্ন

---

* পল্লীগ্রামে গোঁড়ামী বশতঃ যাঁহারা অন্যের সহিত একঘরে বসিয়া খাইতে আপত্তি করেন, এখানে তাঁহারা নানাজনের উচ্ছিষ্ট টেবিলে ও উচ্ছিষ্ট পাত্রে একসঙ্গে বসিয়া আহার করেন! এরূপ ভণ্ডামী দেখিলে কার প্রাণে সরল উদার সাম্যনীতি জাগ্রত না হয়?

প্রকাশকের নিবেদন।

সূর্য্য আপনি ওঠে ফুল আপনি ফোটে, জগতে যে যার পরিচয় আপন কর্ম্মে আপনি দেয়, কেউ কারও মুখ চে'য়ে থাকে না। পূজ্যপাদ-গ্রন্থকার 'স্বনাম ধন্য পুরুষ,' তাঁহার বা তাঁহার গ্রন্থ-নিবদ্ধ ভাবাবলীর সম্যক উপলব্ধি মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবে না, প্রকাশক হওয়া তো দূরের কথা, তবে প্রকাশক বলিতে যদি এই হয় যে, আত্ম-বিস্মৃত অলস-জাতির সুমুখে বইখানি খুলিয়া ধরা, তবে সেই সেবাটুকু করিবার অধিকার আমাকে গ্রন্থকার দিয়াছেন, আমিও তাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি এবং সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্যও আছে, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে নিবেদিত হইল :—

সকলেই জানেন প্রেম—পুণ্য, ঘৃণা—পাপ। কে স্বীকার করিবে, অস্পৃশ্যতা ঘৃণা প্রসূত নহে,—প্রেমের গর্ভজাত? ভীরু তাহারা, মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত তাহারা, প্রেমহীন শুষ্ক-হৃদয় দানব-প্রকৃতি তাহারা, যাহারা ব্যাধির নিমিত্ত আত্মীয়কে পরিত্যাগ করে! তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট তাহারা যাহারা সাময়িক কর্ম্মের জন্য—বংশানুক্রমে ভাইকে অস্পৃশ্যবোধে দূরে রাখে, অবজ্ঞা করে! কৃতজ্ঞতা-ভাজনকে যে বা যাহারা অবজ্ঞা করে, ধ্বংসের হাত হ'তে সে হতভাগ্যদিগকে কে রক্ষা করিবে? পুস্তক এই কথাই জাতিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করাইয়া কর্ত্তব্যে প্রেরণা দিবে। কেহ ভুলিয়া না যান, ইহাই প্রকাশকের নিবেদন।

বিনীত প্রকাশক
শ্রীহরেকৃষ্ণ বিশ্বাস।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের গ্রন্থ-নিচয়।

১। প্রেম-যোগ...২।০
২। নবযুগের সাধনা...।।০
৩। বন্ধুতত্ত্ব চন্দ্রিকা...৸০
৪। বন্ধুলীলায় হরিদাস...১৲
৫। বিশ্বধর্ম্ম......৶
৬। মহাবতারী......৶
৭। হিন্দুধর্ম্ম ও স্পৃশ্যতা...।।০
৮। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান......৪৲

হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা।

প্রথম-স্তবক।

জাতীয় জীবনের উদ্বোধন।

জগতে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি যত জাতি আছে, সমস্তই এক একটি ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। জাতি ও ধর্ম্ম একই সম্বন্ধসূত্রে পরস্পর সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ; সুতরাং জাতির পতন হইলে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মের পতন হইলে জাতির পতন অনিবার্য্য।

ধর্ম্ম চিরদিনই উদার; ধর্ম্মের ভিতরে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী থাকিতে পারে না, তাই জগতে বাস্তবিক কোন ধর্ম্মের মূল সূত্রেই উহা নাই। যেখানেই ধর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া সঙ্কীর্ণতা-মূলক হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা কখনই প্রকৃত ধর্ম্মপদবাচ্য নহে। তথায় এক দিন না একদিন উহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জাতির পতন ঘটিবেই;—সে জাতি পৃথিবীতে যত বড় শক্তি ও সমৃদ্ধি-সম্পন্নই হ'ক না কেন।

আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে যেরূপ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী, সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা ঢুকিয়া জাতিকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংসমুখীন করিয়াছে, ধর্ম্মের গ্লানি ও জাতির কলঙ্কস্বরূপ সেই সব মহাপাপের অবসান করিয়া বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আজ মহাত্মাজীর আত্মত্যাগের মহানুভবতা ও আধ্যাত্মিকতা হইতে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বিষয়ক যে মহাজাগরণের আহ্বান আসিয়াছে, ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মান, চীন, জাপান ও আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশে যে সমস্ত স্বাধীন জাতি শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবে গর্ব্বিত, প্রাচীন ভারতের হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি ও হিন্দুসভ্যতা ইহাদের সকলের প্রাচীন ও আদি। যখন ভারতের তপোবন হইতে ঋষিকণ্ঠে বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদের মহাবাণী, চরম আধ্যাত্মিকতাময় শিক্ষা ও সভ্যতার আলো বিকাশ করিয়া জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিত, তখনকার প্রাচীন ভারতের হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়,—আর্য্যঋষিগণের পরম উদারতা ও গুণগ্রাহিতাই তাৎকালিক সমাজের একমাত্র শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের হেতু। তখনকার সমাজ-শরীর এক অখণ্ড বিরাট দেহে অক্ষুণ্ণ নীরোগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা ক্রিয়াশীল ছিল। একই বিশ্বজনীন উদারতাময় হৃদয়যন্ত্র হইতেই সমবেদনা ও সহানুভূতিরূপ ধমনীর ভিতর দিয়া সর্ব্বত্র জাতীয় জীবনের পবিত্র

রক্তধারা প্রবাহিত হইত, তখন মাথা হইতে হাত-পা খণ্ড বিখণ্ড অবস্থায় দূরে দূরে পড়িয়া পচিয়া গলিয়া মাটিতে মিশিত না, একই রক্তধারায় একই মহাপ্রাণতায় সমস্ত সমাজদেহ সঞ্জীবিত ছিল।

কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে সেই উদারতা ও মহাপ্রাণতার সঞ্জীবনী শক্তি বিলুপ্ত হওয়াতে সমাজদেহ সঙ্কীর্ণতার অস্ত্রে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া আজ বিলীন হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এখন আর হিন্দুজাতির সেই গৌরব, সেই সৌরভ, সেই বিশ্বজর্নীন উদারতা ও মহাপ্রাণতা নাই, আজ হিন্দুর মত জাতীয় জীবনের স্পন্দনহীন, বিচ্ছিন্ন তৃণের মত দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। আজ পৃথিবীর সাম্য-মন্ত্রের বিজয়-শঙ্খ-নিনাদে বধির হইয়া হিন্দু আপন মনে শুধু মোহান্ধতাময় গণ্ডীর ভিতরে লুকাইয়া জাতির সঙ্ঘশক্তি বিস্মৃতিজনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নির্য্যাতন ও মনস্তাপকে জীবন-সম্বল করিয়াছে। ঐ আত্ম-কৃত ভেদনীতি ও ভেদাত্মক আত্মহত্যার মহানাগপাশ যখন আইনে পরিণত হইয়া কায়েমী হইতে চলিয়াছিল তখন মহাপ্রাণ মহাত্মাজী হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মৃত্যু-পণ-ব্রত গ্রহণ করিয়া উপবাস আরম্ভ করিলেন। এই উপবাসের ফলে, আত্মবিস্মৃত জাতির ভিতরে একটা চৈতন্যের সঞ্চার দেখা দিল, মনীষিগণ বিখণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে একত্র জুড়িয়া একটা অখণ্ড সমাজশরীর গঠন করিবার মানসে সর্ব্বত্র মহাত্মাজীর মহাপ্রাণ-পরিস্রুত মৃতসঞ্জীবনী ভাবধারা

ছড়াইয়া সমাজদেহ গঠন ও তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আজ হিন্দুজাতিকে বিভিন্ন মর্ম্মন্তুদ পেষণ, পীড়ন, নির্য্যাতন ও দারিদ্র্যের শোষন হইতে রক্ষাকরিতে হইলে,—বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হইতে হিন্দুর মান, সম্ভ্রম ও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে; হিন্দুকে বাঁচিয়া উঠিয়া আপনার পায় আপনাকে দাঁড়াইতে হইলে; হিন্দুকে জগতের কাছে একটা মর্য্যাদা সম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে, মহাত্মাজীর ঐ মহামন্ত্রে জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন সমাজ-যন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকাগুলিকে একত্র জুড়িয়া দিয়া একই জাতীয় যন্ত্রের মহাসাধনায় নিয়োগ করিতে হইবে। সমষ্টিগত সঙ্ঘ-শক্তি ভিন্ন,—তেইশ কোটী হিন্দুর একতাবদ্ধ জাতীয় জীবনের চৈতন্যের প্রেরণা ভিন্ন, মাত্র উচ্চবর্ণের তিন জনকে মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই। এই জন্য আমাদিগকে অবিলম্বে সঙ্কীর্ণতা-মূলক গোঁড়মী বাদ দিয়া প্রাচীন ঋষিযুগের আদর্শে উদারতাময় সঙ্ঘ-বদ্ধ বিরাট হিন্দুজাতির সংগঠন করিতে হইবে।

প্রাচীন ঋষিযুগের উদার ধর্ম্ম।

প্রাচীন ঋষিযুগে ধর্ম্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শন বলেন,—

"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

যা হইতে ব্যক্তি ও জাতির অভ্যুদয় বা উন্নতি ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি

বা সাফল্য লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। তখন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও কল্যাণ-জনক ব্যবস্থাই ধর্ম্মপদবাচ্য ছিল। যাহা ব্যক্তির, সমাজের ও জাতির পক্ষে অকল্যাণকর, এমন কোন ব্যবস্থাকে ঋষিগণ অধর্ম্ম বলিতেন। এইজন্য তাঁহাদের মহা বাণীতে প্রকাশ,—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

স্বাধীন চিন্তার দিনে জাতির উন্নতির দিক্ দিয়া ঋষিগণ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবাক্য লইয়াই চলিতেন না, দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত কল্যাণকর ব্যবস্থাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ এবং যুক্তিহীন বিচারকে অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন।

বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা।

শাস্ত্রীয় সংবাদে জানিতে পারা যায়,—সৃষ্টির আদিতে সমস্ত মানুষই ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরে তাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হন। এ সম্বন্ধে মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব ১১৮। ১০ ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"

প্রথমতঃ বর্ণের কোন ভেদ ছিল না, সমস্ত মানবই ব্রহ্মার অপত্য মনু হইতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মনু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই জন্য সৃষ্টির আদিতে মনুর অপত্য সমস্ত মানবই ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে 'কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্'—কর্ম্ম দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়েন। কোন্ সময়ে প্রথম এই বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয় তাহাও মহাভারতে ভীষ্মদেবের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
বর্ণানাম্ প্রবিভাগস্তু ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥

সত্যযুগ পর্য্যন্ত মানুষ সবই একবর্ণ ছিল, ত্রেতাযুগে তাহাদের বর্ণ বিভাগ হয়। ত্রেতাযুগে কিরূপে বর্ণবিভাগ হইল, এস্থলে তৎ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে,— একটা সহজ বোধ্য সত্যকথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন,—কেহ একদিন ভারতের সমস্ত হিন্দুকে একটা সভা-ক্ষেত্রে একত্রিত করিয়া আদেশাত্মকভাবে প্রত্যেককে কখনও এই কথা মানিয়া লইতে বাধ্য করেন নাই যে, আজ হইতে তোমাকে ব্রাহ্মণ হইয়া সমাজের পৌরোহিত্য করিতে হইবে; আজ হইতে তোমাকে ক্ষত্রিয় হইয়া দেশ রক্ষা করিতে হইবে; আজ হইতে তোমাকে বৈশ্য হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইবে; এবং আজ হইতে তোমাকে শূদ্র হইয়া ফল শস্য উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য সংগঠন, বস্ত্র বয়ন, বাসগৃহ নির্ম্মান, পাদুকা নির্ম্মান, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মান, পায়খানা পরিষ্কার, রাস্তাঘাট

পরিষ্কার, কাপড় পরিষ্কার ও ক্ষৌরকার্য্য প্রভৃতি সমাজ-সেবার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে । এইরূপ আদেশাত্মক ভাবে কখনও বর্ণবিভাগ হয় না এবং তাহার বৃত্তি বা কার্য্যপ্রণালীও বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। কেননা কাহারও ঐরূপ আদেশ কেহ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে না ; করা সম্ভবও নয়। অতএব ঐ ভাবে যে বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হয় নাই ও হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন । বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আমাদের কথা এই,—

মানুষ কাহারও আদেশে কোন বৃত্তি বা কার্য্য, পূর্ব্বেও অবলম্বন করে নাই এবং এখনও করিতেছে না। মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে আত্মনিয়োগের প্রেরণা তাহার প্রাক্তন গুণ-কর্ম্ম-প্রসূত সংস্কারের ফল মাত্র। এই প্রাক্তন গুণকর্ম্মের প্রভাব-সম্ভূত আত্মিক বিকাশ ও মনের গঠন অনুসারেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেহ ত্রিকালদর্শী ঋষি, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বড় গাথক, কেহ বড় বাদক, কেহ মুক্ত মহাপুরুষ ও কেহ মায়ামুগ্ধ জীব । ঐ প্রাক্তন ভাব বিহ্বলতায় কেহ আপনার মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলিয়া দিয়া তৃপ্তি লাভ করে, আবার কেহ অন্যের বুকে ছোরা মারিয়া তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়,—ধন, প্রাণ মান ও যথা সর্ব্বস্ব লুটিয়া নেয় । ঐ প্রাক্তন গুণ প্রভাবেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ বস্ত্র শিল্পে, কেহ লৌহ শিল্পে, কেহ ফল-শস্য উৎপাদনে, কেহ পাতুকা নির্ম্মাণে, কেহ বস্ত্র পরিষ্করণে কেহ ক্ষৌরকার্য্য-অবলম্বনে আত্মনিয়োগ করিয়া

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আজ প্রবল আত্মাভিমানের যুগেও বিরল নহে। যাঁহারা অভিমানের উচ্চতম হিমাদ্রি-শৃঙ্গে বসিয়া ধরাখানা সরার মত দেখেন, যাঁহারা সমাজ-সেবার কাজগুলিকে ইতরের বৃত্তি বলিয়া মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন, সেই অভিমানী উচ্চবর্ণও স্বীয় স্বীয় প্রাক্তন গুণকর্ম্মের প্রেরণার সংস্কার বশতঃ উহা হইতে দূরে থাকিতে পারেন না ; ঐ নিন্দনীয় কার্য্যেই লিপ্ত হইতে বাধ্য হন। এই জন্য ইঁহারা মুখে যাহাই বলুন না কেন কাজের বেলায় যথেচ্ছাক্রমে কেহ জুতার দোকান, কেহ চামড়ার কাজ, কেহ ধোপার কাজ (ডাইং ক্লিনিং), কেহ তাঁতির কাজ (বস্ত্র বয়ন), কেহ ডোম-মেথরের সর্দ্দারী, কেহ শূদ্র-ব্যবসা দাসত্ব বা চাকুরী, কেহ বৈশ্য-ব্যবসা দোকানদারী, কেহ মৎস্যের ব্যবসা, কেহ মাংসের ব্যবসা ও কেহ মদ্যের ব্যবসা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন! আজ সমস্ত ভারতবর্ষে চব্বিশ কোটী হিন্দু শুধু শূদ্রবৃত্তি দাসত্ব ও বৈশ্যবৃত্তি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছেন। সমাজের নিন্দা ও বংশাভিমানে আজ কাহাকেও তাহার পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বনে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না। কেন এইরূপ হইয়াছে? কেন মানুষকে তাহার পৈত্রিক কার্য্য স্বীয় গণ্ডিতে লিপ্ত রাখিতে পারিতেছে না? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই একরূপ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করিতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কে? জন্মগ্রহণ

করে,—প্রাক্তন গুণ-কর্ম্মের সংস্কার লইয়া জীবাত্মা, নহে কি? ঐ জীবাত্মাই মানুষ জীবাত্মাই কর্ম্মী নয়কি? আত্মা দেহরূপরথে রথী হইয়া মন সারথীর দ্বারা দেহ-রথকে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালন করে। মন আত্মারই কার্য্য-নির্ব্বাহক শক্তি। যতদিন আত্মা দেহে থাকে, ততদিন দেহের চেতনা থাকে, কর্ম্মকরী শক্তি থাকে। আত্মা চলিয়া গেলেই নিষ্ক্রিয় দেহ পচিয়া গলিয়া লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আত্মার—গৌরবেই যে দেহী গৌরবান্বিত, আত্মার বিকাশেই যে মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব, এবং আত্মার মায়ামুগ্ধ অবস্থাতেই যে জীবের হীনতা ও নীচতা, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই অবিনশ্বর নিত্য আত্মাই প্রাক্তন গুণকর্ম্মের সংস্কার লইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। জন্মগ্রহণ কালে ঐ প্রাক্তন গুণাভিষিক্ত আত্মার কোন উপাধি, নাম, ও জাতি-গোত্র থাকে না। সুতরাং মেথর, ডোম, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি মাতৃগর্ভ হ'তে জন্ম গ্রহণ করে না, জন্মগ্রহণকালে কাহারও গায়ে কোন জাতির ছাপ বা মার্কা দেওয়া থাকে না। জন্ম গ্রহণের পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের নামকরণ হয়, এবং প্রাক্তন সংস্কার-জাত রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে স্বীয় স্বীয় পথে স্বীয় স্বীয় আত্মিক ওমানসিক প্রেরণামূলক কর্ম্মে প্রত্যেকে আত্মনিয়োগ করে। প্রত্যেক মানুষই যে স্বীয় স্বীয় প্রাক্তন গুণকর্ম্মের সংস্কার বশতঃ নিজের কর্ম্মপথ বাছিয়া লয় ইহা অভ্রান্ত সত্য। এইজন্য বৈশ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান জগতের

মহামানব এবং আধ্যাত্মিকবিকাশে শ্রেষ্ঠতম ঋষি বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এইরূপে কায়স্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ পরম ঋষি ও পরম ব্রহ্মজ্ঞানী, সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণ ; কেন না ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ (মনু)। যাঁহারা স্বীয় আধ্যাত্মিক বিকাশের শ্রেষ্ঠতায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের জ্বলন্ত ও জীবন্ত ছটায় জগতের তমোকে বিদূরিত করেন, তাঁহারা কায়স্থ বংশজাতই হউন বা বৈশ্য ও শূদ্রবংশোদ্ভবই হউন, তাঁহারা যে জগতের পরিত্রাতা মহামানব ও মহাঋষি, অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তাহাতে কোনরূপ সংশয় থাকিতে পারে কি ? আমরা এই বিষয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলেও তাহার উল্লেখ না করিয়া শুধু ঐ দুটী মহামানবের সম্বন্ধেই এই কথা বলিব যে, ইঁহাদিগকে কুল-গত বৈশ্যবৃত্তি ও শূদ্রবৃত্তিতে স্বীয় গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না কেন ? সহজাত প্রাক্তন গুণ-কর্ম্মের প্রেরণাই কি ইঁহাদের বিশ্বজনীন মহাপ্রাণতা ও মহানুভবতা বিকাশের একমাত্র কারণ নয় ? ইঁহারা যদি সহজাত ঐ প্রাক্তন ঋষিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞ ভাব পরিত্যাগ করিয়া কুলগত বৈশ্যবৃত্তি-বাণিজ্য ও শূদ্রবৃত্তি-দাসত্ব লইয়া বংশানুক্রমিক ধারায় জীবন চালিয়া দিতেন, তবে আজ ভারতের ও জগতের অবস্থা যে আরও কি ভীষণ তিমিরাচ্ছন্ন থাকিত, তাহা কল্পনা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অতএব আমরা দৃঢ়তার সহিত আবার বলিতে চাই ও বলিব যে—

মাতৃগর্ভ হ'তে জন্মগ্রহণ করে,—প্রাক্তন গুণকর্ম্মের ভাব-

ধারায় অভিষিক্ত উপাধি-বর্জ্জিত দেহধারী আত্মা; কোন মার্কা মারা জাতি তাহার পূর্ব্বপুরুষের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণ করে না। প্রকৃত ন্যায় বিচারের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও দেখা যাইবে যে, যখন যে মানুষই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে তাহার পূর্ব্বপুরুষের অনুষ্ঠিত ও অবলম্বিত কার্য্যের জন্য কোন ক্রমেই দায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বে কোন্ যুগে কে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, কোন্ যুগে কে বাহুবলে দেশ রক্ষা করিয়া ছিলেন, কোন্ যুগে কে বাণিজ্য বা দাসত্ব অবলম্বন করিয়া ছিলেন, কোন্ যুগে কে মেথরগিরি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কোন্ যুগে কে জুতা প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছিলেন, আজ সেই বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি তাঁহার ঐ পূর্ব্ববর্ত্তীর গুণ ও কর্ম্মের উপযোগী দেহ, মন, প্রাণ ও শক্তি লইয়া যে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন বা হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি? বিশেষতঃ আজ যিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি যে পূর্ব্ববর্ত্তীর গুণকর্ম্মের, রুচিপ্রবৃত্তির, ভুল-ভ্রান্তির বা আচার ব্যবহারের নিকট আত্মবিক্রয় করিবেন বা ঐ সমস্তকে স্বীয় অবলম্বন বলিয়া বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন, হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে একের কর্ম্মের ফল অন্যের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইবার কোথাও ব্যবস্থা নাই ও থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে যে ঘরে বীরপুরুষ জন্মিয়া দেশ রক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া ছিলেন, আজ যদি সেই ঘরে ভীরু কাপুরুষ ও হীনচেতা লোক জন্মগ্রহণ করে, তবে কি তুমি বাধ্য

করিয়াই তাহাকে পৈত্রিক ধারানুসারে দেশ-রক্ষার কার্য্যে নিয়োজিত করিবে? না কি তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব অনুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে দিবে? প্রত্যেক মানুষই তাহার স্বীয় ভাব বা স্বীয় আত্মার ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মে লিপ্ত হয়; সে কখনও পরের শক্তি, পরের ভাব, পরের গুণ ও পরের সংস্কার অনুসারে কর্ম্মী সাজিতে পারে না। যদি কেহ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ভাব ও গুণ বর্জ্জন করিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে পরের ভাব ও পরের ধর্ম্ম অনুকরণ করিতে যায়, তবে তাহার আত্মিক বিকাশের প্রতিকূল কার্য্যের চাপে পদে পদে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয়। এইজন্য ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, —"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ"।

স্বধর্ম্ম বলিতে প্রত্যেকের স্বীয় আত্মার ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি আত্মার যে ধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই ধর্ম্মের প্রেরণা-মূলক কর্ম্মই তাহার স্বীয় আত্মিক ধর্ম্মের অনুমোদিত। ইহার বাহিরে অন্যের অনুকরণ করিতে গেলে সেই পর-ধর্ম্ম ভয়াবহ হইয়া থাকে। অর্জ্জুনের ভিতরে জন্ম হইতেই ক্ষাত্রতেজ ছিল। তিনি সেই ক্ষাত্রবীর্য্য লইয়া যুদ্ধবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অসাধারণ বীর বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় জন্মগত ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইবার পরে অকস্মাৎ যখন আত্মীয় নিধনের মোহে তাঁহার সহজাত ক্ষাত্রধর্ম্মে ও কর্ত্তব্যে ত্রুটী ঘটিতেছিল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার স্বধর্ম্ম বা সহজাত প্রাক্তন আত্মার ধর্ম্মের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করিলেন।

অর্জ্জুন যদি জন্ম হইতে রজগুণ-প্রধান না হইয়া, স্বত্বগুণ-প্রধান, শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইতেন, যদি তিনি সর্ব্বজীবে ব্রহ্মের বিকাশ দেখিয়া, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু ভাবে বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রেমিক হইতেন, যদি তিনি কাহারও শরীরে কাঁটার আঁচড়টী দেখিলেই ব্যথিত হইয়া পড়িতেন, তবে তিনি জন্ম হইতেই ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি ভাবে মহা উদারতা ও পরার্থপরতা লইয়া জীবন যাপন করিতেন; কেহই অর্জ্জুনকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে ও যোদ্ধারূপে কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইতেন না, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে মধ্যপথে কর্ত্তব্য বিচ্যুতির জন্য উপদেশ দিতেন না। এই জন্য আমরা প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত আত্মার ধর্ম্ম ও প্রাক্তন গুণকর্ম্ম অনুসারে তাহার বর্ত্তমান কর্ম্মপথ নির্ব্বাচন একান্ত যুক্তিযুক্ত, এবং বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে বাধ্য করিয়া রাখা নিতান্ত পাপ বলিয়া মনে করি। বাস্তব জগতে অনন্ত কালই মানুষ ঐ প্রাক্তন আত্মার ধর্ম্ম জনিত সংস্কার লইয়া কর্ম্মী সাজিয়া কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতেছে। এই প্রাক্তন সংস্কারের অনুকূল সাধনাতেই সাধক পুনর্জ্জন্ম বা বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সিদ্ধিলাভ করিতেছে। ঐ যুগ যুগান্তরের সাধনার সিদ্ধিলাভের ফলে, শৈশবেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সমাধি হইত। ঐ সিদ্ধিলাভের ফলেই শৈশব হইতে বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদ প্রভৃতিকে ধর্ম্মজগতে এবং বরাহ, মিহির, ক্ষণা, ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য ও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সার পি, সি, রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, সি ভি, রমন, পণ্ডিত

মালব্যজী ও কবি রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতিকে কর্ম্মজগতে সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে দেখিতে পাইতেছি। এইরূপে মানবাত্মা অনন্তকাল ক্রমোন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রাক্তনে যে সাধক ছিল, আজ সে মহাসাধক বা সিদ্ধ। প্রাক্তনে যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিল, বর্ত্তমানে সে মহাদার্শনিক ও মহাবৈজ্ঞানিক, ইত্যাদি।

মানুষ ঐরূপে প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে যতপ্রকার কর্ম্মেই নিযুক্ত হউক না কেন, তাহাদিগকে শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে চারিটী শ্রেণীতে বিভাগ করা চলে। এই বিভাগ অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আত্মিক বিকাশে শ্রেষ্ঠতম সত্বগুণ-প্রধান ঋষি বা ব্রাহ্মণ আছেন; রজোগুণের আধিক্যে শৌর্য্য-বীর্য্যশালী দেশরক্ষক বা ক্ষত্রিয় আছেন; তমোগুণের আধিক্য লইয়া অন্নবস্ত্রের উৎপাদক সেবাধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র আছেন; এবং ঐ সমাজ সেবকের একটী শাখাই উৎপন্ন অন্নবস্ত্রাদির পরিবেশনকারী ব্যবসায়ী বা বৈশ্য আছেন। এই চারিটী স্তরে দাঁড়াইয়া মানুষ সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ যাবতীয় প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়া জাগতিক স্থিতি রক্ষা করিতেছে। এই কর্ম্মীবিভাগ মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হয় নাই; উহা ভগবৎ বিধানে প্রাক্তন গুণকর্ম্মের প্রভাব ও সংস্কার অনুসারে হইয়াছে। এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"।

ভগবৎবিধানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐ কর্ম্মী-বিভাগ ক্রমোন্নতির পথে ধাবমান। যতদিন ঐ সহজাত স্বাভাবিক গুণ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মী-বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়, যতদিন মানুষের আত্মিক

ধর্ম্মের উপর বাধ্যতামূলক চাপ না পড়ে, যতদিন মানুষ প্রাক্তন-প্রসূত গুণের অনুকূলে অনুশীলন করিয়া উহাকে বাড়াইয়া তুলিতে অবকাশ ও সাহায্য পায়, ততদিন মানুষের সহজাত প্রতিভা ও আত্মিক শক্তির ক্রমবিকাশে অমৃতময় ফল ফলে। আর যখন হইতে মানুষকে পরের নির্দ্দেশ অনুসারে বাধ্যতামূলক আওতার তলে থাকিয়া পরের ভাবে ও পরের আদর্শে বংশানু ক্রমিক বৃত্তির আশ্রয়ে অনুকরণকারী কর্ম্মী সাজিতে হয়, তখন-তাহার আর আত্মপ্রতিভা-বিকাশের উপায় থাকে না, জোর করিয়া তাহার আত্মশক্তি ও বিকাশোন্মুখ প্রতিভাকে পিষিয়া মারা হইয়া থাকে। যে দিন হইতে ভারতবর্ষে কর্ম্মী সঙ্ঘগুলিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মার্কাদিয়া বংশানুক্রমিকভাবে বাধ্যতা-মূলক পৃথক পৃথক গণ্ডীবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, তখন হইতেই হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির সম্পূর্ণ পতনের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় অনেকে উপযুক্ত গুণকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়াও বংশানুক্রমিক সম্মান ও গৌরব লাভের জন্য গীতার চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দে চতুর্ব্বর্ণ বা চারিবর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া, ভগবান যে মানুষকে বংশপরম্পরাভাবে চারিটী বর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই অনুকূলে যুক্তি তর্ক দেখাইয়া স্বীয় মতের সমর্থন করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, প্রকৃত কথা হইতেছে,—মানুষের ক্রমোন্নতি বিধানের জন্য বল্লাল সেন যেমন আচার, বিনয় ও বিদ্যা প্রভৃতি নয়টী গুণের সমবায়ে কৌলিন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঐ নবগুণ বা কৌলিন্য বাদ দিয়া তিনি বংশানু-

ক্রমিক কুলীনের সৃষ্টি করেন নাই; শ্রীভগবানও তেমন প্রাক্তন গুণকর্ম্মের প্রভাবসম্ভূত আত্মিক-শক্তির বা চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি গুণকর্ম্মের প্রভাব বাদ দিয়া বংশগত চতুর্ব্বর্ণের (চারি বর্ণের) সৃষ্টি করেন নাই। কৌলিন্যের নয়টী গুণ হৃদয়স্থ হইলে, মানুষ যেমন কুলীন হইতে পারে সেইরূপ হৃদয়-নিহিত প্রাক্তন আত্মিক ভাব সমূহের বা চাতুর্ব্বর্ণ্যের তারতম্য অনুসারে মানুষ চারি প্রকার কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া চারিটী স্তরে আসিয়া দাঁড়ায়। এই চারিটী ধাপই চারি বর্ণ। বল্লালের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও কৌলিন্যের নবগুণ বাদ পড়িয়া বংশগত কুলীনের বিষময় ফলে যেমন সমাজ ধ্বংশ হইতেছে, তেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যের যথোপযুক্ত গুণ ও প্রভাব বাদ পড়িয়া বংশগত চারি বর্ণের প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুর ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুর্ব্বর্ণ শব্দ দুটীর বিভেদ বুঝিলেই পাঠক মহাশয়, ভগবৎ বর্ণ-বিভাগ ও বংশগত বর্ণ-বিভাগের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ত্রেতাযুগে যে সময় হইতে বর্ণ-বিভাগ আরম্ভ হইয়াছিল, তখনও বংশানুক্রমিক জাতি বিভাগ হয় নাই, তখনও মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিত না, জন্ম গ্রহণের পরে কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাংগতম্ অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মীসঙ্ঘের বা শ্রেণীর বিভাগ হইত। কেননা—

যে সমস্ত লোক এক প্রকার কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করে, সেই সম-কর্ম্মীদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, ঘনিষ্ঠতা,

সহযোগিতা ও ভাবের আদান-প্রদান প্রভাবে এক একটী সঙ্ঘের গঠন স্বভাবতঃই ঘটিয়া যায়। এইরূপে কৃষকসঙ্ঘ, শ্রমিক-সঙ্ঘ, তন্তুবায়সঙ্ঘ, ঋষিসঙ্ঘ, সৈনিকসঙ্ঘ, সেবকসঙ্ঘ ও ব্যবসায়ী বা বণিকসঙ্ঘের সৃষ্টি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে, ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির ভিতরেও ঐ কর্ম্মীসঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছিল। উহাই ভগবৎ-বিধানানুযায়ী স্বাভাবিক বর্ণ-বিভাগ। ঐ স্বাভাবিক বর্ণ-বিভাগে বংশপরম্পরাগত বৃত্তি বা কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই ও থাকিতে পারে না। প্রাচীন ভারতে উহা ছিল না এবং বর্ত্তমান ভারতেও কার্য্যতঃ উহা মোটেই নাই; আছে শুধু মৌখিক গোঁড়ামী মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বংশানুক্রমিক বর্ণবিভাগ নাই। অন্যান্য দেশে বর্ত্তমানেও প্রাচীন ভারতের ন্যায় যে কোন নিম্নবর্ণ গুণগ্রাহিতা প্রভাবে, সমাজের নেতার আসন পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আচার্য্য পি, সি, রায় মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত জগতের কুত্রাপি এখন এইরূপ বর্ণগত কর্ম্ম-নির্দ্দেশ বা অস্পৃশ্যতা নাই। চীন দেশে পঁয়তাল্লিশ কোটী লোকের বাস, সেখানে এ পাপ নাই; ইংলণ্ডে নাই, আমেরিকায় নাই। ইংরাজ ও আমেরিকান লেখকেরা বলেন, বিগত তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত তাঁহারা খুজিয়া পান নাই। সর্ব্বত্র এই দেখি—সকল বর্ণের লোকই স্ব স্ব ইচ্ছা বা সুযোগ অনুযায়ী সকল কর্ম্মই অবলম্বন করিতে পারে।

কোথাও দেখি না, পুরুষপরম্পরায় চামার, মেথর বা

ধাঙ্গরেরা অচলায়তনের মত রহিয়াছে। চামার, মেথরের কাজও সব দেশে কেউ ঘৃণা তো মনে করেই না বরং নগরীর উপকণ্ঠে যে সকল কৃষক আছে, তাহারা সাররূপে ব্যবহারার্থ বিষ্ঠা প্রভৃতি নাগরিকদিগের নিকট যাচ্ঞা করিয়া থাকে। আর ভারতে যে চামার, মুচি জন্মিল, সে চিরদিন চামারই রহিয়া গেল!

চামার থেকে রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু আছে। লয়েড জর্জ্জের বাপ যখন মারা যান, তখন তার বয়স সবে মাত্র তিন বৎসর। তাকে প্রতি-পালনের ভার গ্রহণ করেন তাহার মামা। এই মামাই একজন চর্ম্মকার।

সোভিয়েট তন্ত্রের কর্ত্তা ষ্টালিনের পিতা একজন মুচি,—চামারও নয়। বাল্যকালে ষ্টালিন জুতা সেলাই করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতেন।

কোটিপতি মিঃ বাটাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মুচিগৃহে, ইনি অল্প দিন হইল মারা গিয়াছেন। আজ তার ছেলে দশখানি এরোপ্লেনের মালিক, তাই চাপিয়া তিনি সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ান!

তার পর জীবাণু-বিজ্ঞানের যিনি পত্তন করেন, সেই লুই পাস্তুর জন্মেছিলেন এক দরিদ্র চর্ম্মপরিষ্কারকের কুটীরে। রবার্ট ডিউক অব নর্ম্যাণ্ডি বিবাহ করিয়াছিলেন এক চর্ম্মকারের কন্যাকে। আর তাঁহারই গর্ভে জন্মেছিলেন—উইলিয়ম দি কাঙ্কারার।

মিশনারী উইলিয়ম ক্যারী সাহেব, যাঁকে বাঙ্গালা

গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলা যায়, বাল্যকালে মুচির কাজ করিতেন।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা হুভার সাহেব প্রথম জীবনে ঘোড়ার সহিস ছিলেন।

কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা সর্ব্বত্র এইরূপ সমাজের সর্ব্ব-স্তরের লোক ইচ্ছানুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কালে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম এই ভারতে। চামার চিরকালই চামার। বৃহদক্ষরে তাহার দ্বারদেশে লিখিত রহিয়াছে—"যাহারা এই দ্বারপথে প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে চিরতরে সকল উচ্ছ্বাস বিসর্জ্জন দিতে হইবে।"

প্রাচীন ভারতে যে বর্ত্তমান ভারতের ন্যায় এইরূপ বংশগত বর্ণবিভাগ ছিল না, সে সম্বন্ধে শুক্রনীতি ৩৮।১ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব ন।
ন শূদ্রো ন চ'বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতঃ গুণকর্ম্মভিঃ॥"

জন্ম হইতে কেহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ হয় নাই, ঐ সব ভেদিতঃ গুণকর্ম্মভিঃ, গুণকর্ম্ম দ্বারাই ঐ সব বর্ণভেদ হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্মপর্ব্ব ৪২ অধ্যায় বলিতেছেন,—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্তাৎ শ্বপাকাচ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলুক্যাঃসূতোঽভবৎ।

মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দোপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে।
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকী গর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনয়ঃ॥

ব্যাসদেব কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভে, পরাশর মুনি নমশূদ্রার গর্ভে, শুকদেব শুকী নামক শূদ্রার গর্ভে, কণাদ ঋষি উলুকী নামক শূদ্রার গর্ভে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী নামক শূদ্রার গর্ভে, বশিষ্ঠদেব বেশ্যা-গর্ভে, মন্দপাল নামক মহামুনি নাবিক বংশে, মাণ্ডব্য মুনি মণ্ডুকী নামক শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা ভিন্ন বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্র-যোনয়ঃ—অর্থাৎ ইহা ভিন্ন যাহারা শূদ্রাগর্ভজাত তাহারাও বহুসংখ্যক লোক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সব যে সমাজের গুণগ্রাহিতারই প্রমাণ, গুণের জন্যই যে এইরূপ নিম্নস্থানজাত যে কেহ দেবত্ব, ঋষিত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় ও জগৎবরণ্য হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতের উদার গুণগ্রাহী ঋষিযুগে ঐরূপ অগণিত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। ব্যাস, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রভৃতির ন্যায় বিদুর, সঞ্জয়, লোমহর্ষণ, যুযুৎসু প্রভৃতিও শূদ্রাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মহানুভব ঋষিতুল্য ছিলেন। ইহা ভিন্ন সৌতি সূতজাতিতে এবং ধর্ম্মব্যাধ ব্যাধবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতে বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় সমস্যাপাদ ২০৫-২১২ অধ্যায়ে আছে, ধর্ম্মব্যাধ কৌশিক ব্রাহ্মণকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ঐ মোক্ষ-

ধর্ম্ম পর্ব্বে ২৬০ —২৬৩ অধ্যায়ে আছে,—বৈশ্যবংশীয় তুলাধার জাজলি ঋষিকে ব্রহ্মবিদ্যা ও মোক্ষোপদেশ দিয়াছিলেন। মৎস্য ও বায়ুপুরাণে আছে—দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে দাসী উষিজের গর্ভে কক্ষিবান জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঋগ্বেদের ১১৬-১২১ সূক্তের রচয়িতা ঋষি। ইহা ভিন্ন দাসীগর্ভজাত দেবর্ষি নারদ নরলোকে ও দেবলোকে পূজিত হইয়া রহিয়াছেন। বেশ্যাগর্ভজাত জাবালি সত্যনিষ্ঠার গৌরবে গৌতমের উদারতায় বেদপারগ-ব্রাহ্মণ হইয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

ঋষিযুগে ঐরূপ গুণগ্রাহিতা অনুসারে মনুষ্যত্বের পূজা ছিল বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি গুণে, জ্ঞানে, সভ্যতায় ও আধ্যাত্মিকতায় জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ঐ গুণের পূজা সম্বন্ধে পরম উদার হিন্দুশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

নজাতি পূজ্যাতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালোঽপি বৃত্তস্থং তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ (মহাভারত)

হে রাজন্! জাতি পূজনীয় নহে, কল্যাণকর গুণই পূজনীয়। এইজন্য দেবগণ গুণবান চণ্ডালকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। তাই গুণ অনুসারে ব্যক্তির যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীমৎ ভাগবৎ বলিয়াছেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

যে বর্ণের যে লক্ষণ, যদি অন্য বর্ণের ভিতরে সেই লক্ষণের

ব্যক্তি দৃষ্ট হন, তবে তাঁহাকে লক্ষণ অনুরূপ বর্ণ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ শূদ্রের ভিতরে যদি কাহারও সত্ত্বগুণ দৃষ্ট হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ; এবং ব্রাহ্মণবর্ণে যদি কাহাকেও শূদ্র বা বৈশ্য প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত তম ও রজগুণাদিযুক্ত দৃষ্ট হয়, তবে তাঁহাকে শূদ্র ও বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে জাতি কাহারও কায়েমী করা নহে, উহা গুণেরই মূর্ত্ত-বিকাশ। যাহার ভিতর হইতে যেরূপ গুণের বিকাশ হয়, তিনি সেই জাতির অন্তর্গত। বাস্তবিকই শরীরটা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নয়; আভ্যন্তরিক সত্ত্বগুণ, রজগুণ এবং তমগুণই ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও শূদ্রত্বের প্রকাশক।

ইহার পর আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছেন,—কেহ চিরদিন নীচ বা উচ্চ থাকে না,—

"ধর্ম্মচর্য্যায়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যায়া পূর্ব্বোবর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ॥

ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিম্ন জঘন্য-বর্ণ জাতি-পরিবর্ত্তন বশতঃ ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ শূদ্রবর্ণ, শূদ্র বৈশ্যবর্ণ, বৈশ্য ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আর অধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পূর্ব্ববর্ণ জাতির পরিবর্ত্তন বশতঃ নিম্নদিকে নামিয়া গুণের হীনতানুসারে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বর্ণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণ, বৈশ্য শূদ্রবর্ণ এবং শূদ্র ম্লেচ্ছবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থায় শূদ্রও ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, এবং ব্রাহ্মণও

ক্রমে অধর্ম্মাচারণ দ্বারা শূদ্রত্বে আসিয়া উপনীত হয়। ইহাই আমাদের ঋষিযুগের গুণগ্রাহিতামূলক উদার ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। ইহাতে প্রত্যেক মানুষেরই অবাধে আত্মিক শক্তির ও প্রতিভার বিকাশ হওয়াতে সমস্ত মানুষই সহজে উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে উঠিয়া আত্মার পূর্ণবিকাশে ঋষিপদবাচ্য হন।

এ পর্য্যন্ত যাহা উল্লেখ করা হইল, তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাইতেছে—সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ, কোন বর্ণ-বিশেষের অধিকারভুক্ত নয়, যে কোন বর্ণেই ঐ সত্ত্ব, রজ ও তম গুণান্বিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; সেইজন্য নিম্নস্থানেও সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যাস ও বশিষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় নরবেশধারী অমর দেবতার আবির্ভাব দেখিতে পাই, এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ভিতরেও তমগুণী দস্যু-তস্কর দৃষ্ট হয়। অতএব এ কথা অকপটে ও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, আজ পর্য্যন্ত যদি প্রাচীন ঋষিযুগের ন্যায় উদারতা ও গুণগ্রাহিতা বিদ্যমান থাকিত, তবে এ পর্য্যন্ত নিম্নস্থান হইতে আরও বহু ব্যাস, পরাশর ও নারদ প্রভৃতির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি অধ্যয়নে সর্ব্ববর্ণেরই সমান অধিকার থাকাতে যেমন যে কোন জাতীয় লোকই, অধ্যাপক বা আচার্য্য গুরুর আসনে বসিবার অধিকার পাইতেছেন, পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে উদার ঋষিযুগে তেমন সকলেই সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতির গবেষণা করিতে

পারিতেন বলিয়াই চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে যাঁহাদের জন্ম, এরূপ গণিকাত্মজ প্রভৃতিকেও আচার্য্যগুরুর আসনে সমাজের কর্ণধার-রূপে সম্মানিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন জাতিবর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া সকলেই ঋষিপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। বর্ণনির্ব্বিশেষে পুরুষদের ঋষিপদে অধিকারলাভের বিষয় দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন দেখাইব স্ত্রীলোকদেরও ঐ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। বেদে পর্য্যন্তও স্ত্রীলোকের কিরূপ অধিকার ও প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত বিবরণ প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে—

শাশ্বতী ঋগ্বেদের ৮।১।৩৮ সূক্তের ঋষি; লোমশা ঋগ্বেদের ১।১২৬ সূক্তের ঋষি; লোপামূদ্রা ঐ বেদের ১।১৭৯ সূক্তের ঋষি; অদিতি ঐ ৪।১৮ সূক্তের ঋষি; বিশ্ববরা ঐ ৫।২৮ সূক্তের ঋষি; বাগাম্ভৃনী ঐ ১০।১২৫ সূক্তের ঋষি; সূর্য্যা ঐ১০।২৫ সূক্তের ঋষি ও ঘোষা ঐ ১০।৩৯ সূক্তের ঋষি ছিলেন। ইহা ভিন্ন গার্গী, মৈত্রেয়ী ইলা, অদিতি, বাচক্লবী ও সুলভা প্রভৃতি বহু স্ত্রীলোক ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিনী ঋষি ছিলেন। যখন রাজর্ষি জনকের সহিত যাজ্ঞবল্কের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বিচার হয়, তখন ঐ সভায় সমাগত বহু মুনিঋষির মধ্যে গার্গী মধ্যস্থা ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে শঙ্করাচার্য্যের সহিত যখন মণ্ডন মিশ্রের ও কুমারিল ভট্টের শাস্ত্রবিচার হয়, তখন যথাক্রমে মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়-ভারতী ও কুমারিলের স্ত্রী সরস্বতী দেবী মধ্যস্থা ছিলেন, ইহাই প্রাচীন বর্ণাশ্রমের নমুনা!

২০৬৪৫/ তা: ১০/৯/৯৬৮০

সঙ্কীর্ণতার গোঁড়ামী।

যে দেশে স্ত্রীলোকের বেদে, ব্রহ্মবিদ্যায় ও শাস্ত্রবিচারে ঐরূপ উচ্চ অধিকার ছিল, যে দেশে বিপক্ষের পত্নীকে পর্য্যন্ত মধ্যস্থা স্বীকার দ্বারা ধর্ম্মবিশ্বাস ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত, যে দেশে চণ্ডালাদি নিম্নবর্ণ হইতে শাস্ত্রকর্ত্তা পরাশর, ব্যাস, ও বশিষ্ঠ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দেশের অন্য বর্ণের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিত উচ্চবর্ণ ও ব্রাহ্মণের ঘরের মাতৃস্থানীয়াগণ পর্য্যন্তও একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামীর ফলে বেদের অধিকার বর্জ্জিত হইয়া শূদ্র ও শূদ্রা হইয়া রহিয়াছেন! কর্ত্তাদের আজগবি ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের স্ত্রী, ভগ্নী ও মাতা পর্যান্ত শূদ্রা! অন্যান্য বর্ণের মত ইঁহাদেরও প্রণবে অধিকার নাই! ইঁহারা শূদ্রা বলিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ, নারায়ণবিগ্রহ স্পর্শ ও অর্চ্চনা করিতে পারেন না!! দুঃখের কথা বলিব কি, ব্রাহ্মণের ঘরের মাতৃস্থানীয়াগণ ব্রাহ্মণ-পতির পত্নীত্ব করেন, ব্রাহ্মণসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের শূদ্রত্ব কখনও দূর হয় না! ইঁহারা রান্না করিয়া দেন, পরিবেশনও করেন, কিন্তু নিজেরা শূদ্রা বলিয়া খাওয়ার সময় কোনক্রমে ছুঁইলে এই শূদ্রার স্পর্শে ব্রাহ্মণের খাওয়া নষ্ট হয়!! এইরূপ গোড়ামীপূর্ণ অযৌক্তিক সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা যখন হইতে সমাজে ঢুকিয়াছে, তখন হইতেই যে, হিন্দুসমাজ ধ্বংশের পথে গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সমাজ ধ্বংশ হইয়া যাক্, আপনার 'মা'

চিরদিন শূদ্রা হইয়া থাক্ তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়া নিজেকে বড় গলায় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়াই চাই, এবং অন্য কেহ বেদ পাঠ করিলে তাঁহার জিভ্ কাটা চাই, কেহ বেদ শুনিলে তাঁহার কাণে সীসা প্রভৃতি ধাতু গালাইয়া ঢালিয়া দেওয়া চাই !! সমাজপতি এইরূপ স্বার্থপরতা-মূলক অন্ধ-গোঁড়ামীর ও সঙ্কীর্ণতার দাস না হইলে কি আজ হিন্দু-সমাজ রসাতলে যায় ? হায় ! গুণগ্রাহিতার অভাবে কত মণিরত্ন যে ভারতের মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, এবং কত অকিঞ্চিৎকর কাচও যে শিরোভূষণ হইয়াছে, কে ইহার সন্ধান রাখে ?

সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন কি সঙ্গত নয় ?

যাহা হইবার হইয়াছে, এখন জিজ্ঞাসা করি,—পৃথিবীর স্বাধীন চিন্তা ও সাম্যমৈত্রীর দিনে আমরা কি আমাদের প্রাচীন ঋষিযুগের গুণগ্রাহিতা-মূলক উদার আদর্শ গ্রহণ করিব ? না কি মোহান্ধতাময় সঙ্কীর্ণতা লইয়া জঘন্য নির্ম্মম অত্যাচার-মূলক লোকাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া আত্মহত্যা, সমাজহত্যা এবং জাতির ও দেশের ধ্বংসকারী ব্যবস্থার প্রচলন রাখিব ? আমরা কি ঋষিযুগের আদর্শকে শিরোধার্য্য করতঃ ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে

মানুষ মাত্রকেই উন্নত ও পবিত্র বোধে সমাজশরীরের অঙ্গীভূত করিয়া জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিব ? না কি তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন তৃণের মত দূরে ফেলিয়া রাখিয়া সমাজ ও জাতিকে হাত পা শূন্য দারু-বিগ্রহের মত অচল ও শক্তিহীন করিয়া রাখিব ? আমাদের যেরূপ গোঁড়ামী, তাহাতে নারদ, পরাশর, ব্যাস ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনি-ঋষি ও মনীষীদিগকে যদি আমরা দাসীপুত্র, বেশ্যাপুত্র ও নীচবংশজাত বলিয়া হিন্দুসমাজের খাতা হইতে নাম কাটিয়া দেই এবং অস্পৃশ্য মনে করি ; ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবকে যদি জন্মগত দোষ উদ্ঘাটন করিয়া বাদ দিয়া ফেলি, তবে আমাদের ধর্ম্মের ও জাতির গৌরব থাকিবে কাহাকে লইয়া ? বরং ইহাই কি আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির গৌরবের বিষয় নয় যে, আমরা গুণের পূজা জানি বলিয়াই কুৎসিত-স্থান সম্ভূত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ এবং মুনিঋষির আসনে বসাইয়া জাতির ও সমাজের নেতারূপে পূজা করিয়া থাকি ! আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ইহাই কি পরম গৌরবের বিষয় নয় যে, আমরা গুণ-গ্রাহিতায় মানুষকে দেবতার ও ভগবানের আসনে পর্য্যন্ত বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছি ! গুণের পূজায়ই কি নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও দশরথাত্মজ রামচন্দ্র ভগবানের আসনে বসিয়া পূজিত হইতে-ছেন না ? জন্মের বিচার লইয়া কোন ব্রাহ্মণকেই ত কোন দিন কৃষ্ণের ও রামের পূজায় এবং প্রসাদে আপত্তি করিতে শুনিতে পাই না ? ব্যাস পূজাই বা কোন্ ব্রাহ্মণ না করিয়া থাকেন ?

চিরসত্য নিত্যপবিত্র হিন্দুধর্ম্মকে এ পর্য্যন্ত কেহ নষ্ট ও

অপবিত্র করিতে পারে নাই। নিত্যশুদ্ধ গঙ্গাজল যেমন অপবিত্র অঙ্গে অর্পিত হইলে স্পর্শদ্বারা নষ্ট না হইয়া অপবিত্রকেই পবিত্র ও শুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ চিরশুদ্ধ নিত্যপবিত্র মহান্ উদার হিন্দুধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত কাহারও স্পর্শদ্বারা নষ্ট হয় নাই, বরং এই উদার ধর্ম্মের পবিত্র ক্রোড়ে নীচ উন্নত হইয়াছে, অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে, মানুষ দেবতা হইয়াছে !! এমন ধর্ম্ম দ্বিতীয় আছে কি ? এমন জাতি দ্বিতীয় ছিল কি ? যেখানে পতিতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্রাটের সিংহাসনেরও উপরে ! হায় ! সেই ধর্ম্ম ! সেই জাতি ! এবং সেই আমরা !! আজ একমাত্র সঙ্কীর্ণতার ও ছুঁৎমার্গের মহাপাপে সেই আমাদের এই পদদলিত বিচ্ছিন্ন তৃণের মত দুর্দ্দশা !!

আমাদের ধর্ম্মের ও জাতির উপর দিয়া বহু রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, ও ধর্ম্মবিপ্লব বহিয়া গিয়াছে ; তাৎকালিক দেশের ও সমাজের অবস্থা, চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ভারতব্যাপী সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধযুগের ইতিহাস স্মরণ করিলে আমাদের গোঁড়ামীটা সহজেই বিদূরিত হইতে পারে। বর্ত্তমান পৌনে ষোল আনা হিন্দুই যে শঙ্করাচার্য্যের কৃপায় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন ? ইহা ভিন্ন শক, হুন, তাতার, খাসিয়া, গারো ও সাওতাল প্রভৃতি বহুজাতি যে হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এই ঐতিহাসিক সত্য কি উদার হিন্দুধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছে না ? সেই ভক্ত

প্রাণ খুলিয়া বড় গলায় বলিতে চাই,—মৃতের প্রাণদান করিতে পারে, অপবিত্রকে পবিত্র করিতে পারে, স্পৃশ্যতা সহ্য করিতে পারে, আঘাতকে প্রতিহত করিতে পারে এবং বিষ খাইয়া জীর্ণ করিতে পারে বলিয়াই মহান্ হিন্দুধর্ম্ম মৃত্যুকে জয় করিয়া আজিও পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে। নতুবা গত বৈপ্লবিক যুগে হিন্দুজাতির নামগন্ধ পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যাইত।

যাঁহারা শুধু ঘোম্‌টার আড়ালে হিন্দুধর্ম্মের আসন দেখিতে পান, যাঁহারা অন্তঃপুরচারিণী ললনার মত হিন্দুধর্ম্মকে অসূর্য্য-স্পশ্য মনে করিয়া আপনাদের দুই চারি জনকে উহার অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিশ্বজনীন মহান্ উদার হিন্দুধর্ম্মের মহাপ্রাণতার খবর রাখেন না বলিতে হইবে। খবর রাখিলে, প্রাচীন ঋষিযুগের পিতৃপুরুষদিগের মহান্ আদর্শ কখনো বিস্মৃত হইতেন না। শুধু নিজের অন্তঃপুরের ভিতরে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বদেশ মনে করার মত ভ্রান্তি, বোধ হয় আর কিছুই নাই। যাঁহারা ঐরূপ গণ্ডীবদ্ধ ধারণা লইয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে বহির্জ্জগত, সমাজ ও জাতির মহাশক্তি হইতে দূরে থাকিয়া, নিজেই প্রকৃত অস্পৃশ্য বা একঘ'রেরূপে অবস্থান করেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, একা একা কখনও বড় হওয়া যায় না, জাতির ও দেশের সমষ্টিগত সর্ব্বব্যাপী গঠনমূলক শক্তিই প্রকৃত জাতীয় জীবন। জাতীয় জীবন গড়িতে হইলে সমাজের নেতা জাতিকে স্বীয় পরিবারের ভিতরে আনিয়া স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে অপত্যনির্ব্বিশেষে

চুম্বন করিয়া থাকেন, এখানকার অভিধানে "সঙ্কীর্ণতা" শব্দ স্থান পাইতে পারে না, তাই আমাদের প্রাচীন ভারতের স্বাধীন মনে অস্পৃশ্যতা ছিল না।

হিন্দুর মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ-বেদান্তের নির্দ্দেশে এক ব্রহ্মই যাবতীয় বিশ্বচরাচররূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, "বহুস্যাম্" শব্দ তাহারই প্রমাণ। ভগবানই মানুষ হইতে কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্তরূপে প্রকট। সুতরাং বেদ-বেদান্তের নির্দ্দেশে সকলকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ, পরমেশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের এই মহাবাণী অনুসারে সর্ব্বজীবই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, সুতরাং বেদ ও গীতার নির্দ্দেশে অস্পৃশ্য বলিতে কেহই নাই।

আত্মশুদ্ধি ঘটিলে বা মন পবিত্র হইলে জগতই পবিত্র, কোথাও অপবিত্রতা থাকে না। পক্ষান্তরে নীল চশমা চক্ষে দিলে যেমন জগৎ নীলবর্ণ দেখায়, সেইরূপ মোহের অন্ধকারে নিজের আত্মা মলিন হইলে, অবিশুদ্ধ মন, সর্ব্বত্র অপবিত্রতা দেখিতে পায়, ইহাই অস্পৃশ্যতার জনক। সুতরাং অস্পৃশ্যতাটী বাহিরের জিনিষ নয়, যাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করা হয়, তাঁহারা অপবিত্র বা অস্পৃশ্য নন, যিনি অস্পৃশ্য ভাবেন ও দেখেন, তিনিই অপবিত্র এবং তাঁহার মন অপবিত্র, ইহা ভিন্ন অস্পৃশ্যতার ভিতরে আর কোন সত্ত্বা নাই, সুতরাং সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জনীয়।

সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত অসৎ-শাস্ত্র।

মধ্যযুগের পরাধীন ভারতে যখন আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বজনীন উদার-ভাব লোপ পাইল, সাম্য-মৈত্রীর মহাবাণী অন্তর্হিত হইল তখন হইতে মোহের আতিশয্যে আমাদের আত্মাভিমান ও বংশগরিমা শীর্ষস্থানে দাঁড়াইল, গুণের পূজা দূরে গেল, জাতীয় জীবনের মহান্ আদর্শ ও মহৎ-চিন্তা পরিত্যক্ত হইল, কেবল একমাত্র সাধনার বিষয় হইল—'আমি বড় আর তুমি ছোট'। এই আমি বড় আর তুমি ছোট অভিমানই জাতীয় পতনের সর্ব্ববাদীসম্মত অমোঘ বজ্রাঘাত। বহু পাপের ফলে জাতি এই আঘাতে বিচূর্ণ হইয়া যায়।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন ব্রাহ্মণসমাজে সংস্কৃতের বহুল চর্চ্চা ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ব্যক্তিগত মনোভাব-প্রসূত নানা গ্রন্থপ্রণয়নের মত তখন পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় ভাব অনুসারে সংস্কৃতে নানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন; এবং যাঁর যাঁর মত প্রবল রাখিবার জন্য ভি নানা প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলেন। এইরূপে বহু মতের ও বহু বিরুদ্ধ ভাবের বহু সংস্কৃত পুথির জন্ম হইল। লেখকগণ শুধু নিজে গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, প্রাচীন মূলগ্রন্থ সমূহের ভিতরেও আবশ্যক মত প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের দ্বারা নিজ মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে অনেক

মূলগ্রন্থ পড়িলে বিরুদ্ধমতের শ্লোকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। আসলের ভিতরে নকল,—চালের ভিতর তূষের মত আপনা আপনি পৃথক হইয়া দাঁড়ায়।

তখনকার গ্রন্থের সহিত বর্ত্তমান সময়ের লেখার প্রভেদ এই, তখন মুদ্রাযন্ত্র ও খবরের কাগজ ছিল না, যিনি যে তালপাতার পুথি লিখিতেন, তাহার বহুল প্রচার হইত না, এবং তাহা লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলনও হইত না। যাঁহার মত, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভিতরে যতদূর সম্ভব—সাফল্যের চেষ্টা করিতেন। তাৎকালিক ঐরূপ যে সমস্ত সংস্কৃত পুথি বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন ভাব লইয়া বিরাজ করিতেছে,—আমাদের র্ত্তমান সময়ের নিকট উহার সবই ধর্ম্মশাস্ত্র! উহা না মানিলে অহিন্দু হইতে হয়, ইহাই গোঁড়াদিগের অন্ধ বিশ্বাস।

অনুস্বর ও বিসর্গযুক্ত যা তা একখানি সংস্কৃত পুথিই যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া শিরোধার্য্য হইতেছে, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে এক খানা অদ্ভুত পুরাণের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

সকলেই জানেন,—দেবতাদের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের মত অমন ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ আর কেহই নাই। এই অহিংস নিষ্কাম যোগীশ্বরের গলায় ভীষণ কেউটা সাপও স্বীয় স্বভাব ভুলিয়া ফুলের, মালার মত বিরাজ করিতেছে! বাঘ-ছাল-পরিহিত, শ্মশানবাসী এহেন পূর্ণ পবিত্রতা ও নিষ্কামতার

আধারকে কোন এক গাঁজাখোর পুরাণ-লেখক গাঁজার কল্কিতে দম দিয়া এমন বীভৎস কামের পাগলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে অশ্লীল ঘটনা প্রকাশ করা লেখনীর অসাধ্য। সেই কাম-কুৎসার অশ্লীল ও অদ্ভুত ব্যাপার লইয়াই সমাজে শিবের পূজা বাদ দিয়া তাঁহার লিঙ্গের পূজা প্রচলিত হইয়াছে !*

*অনেকেই অনুমান করেন, যখন নানাজনে নানামতের শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণ লিখিতেছিলেন, তখন ঐসব মনগড়া শাস্ত্রকে টিট্‌কারি দেওয়ার জন্য জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত ঐ লিঙ্গ-পুরাণ লেখেন। কালক্রমে উহাই হইল ধর্ম্ম-শাস্ত্র, এবং কুসংস্কারাপন্ন শাস্ত্রবাদীর দল ঐ পুরাণের মতটী অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন !! তাঁহারা শুধু শাস্ত্রের মর্য্যাদাই রক্ষা করিলেন না, প্রস্তর বা মাটির লিঙ্গ-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উহাকে আবার যোনি-পিটের ভিতরে স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন !! এইজন্য যত শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই যোনি-যন্ত্রে অবস্থিত! নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে উহার ভিতরে অবস্থান ভিন্ন শিব-লিঙ্গ যেন মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারেন না !! হায়! যাহা মা ও ভগ্নীদিগের নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই, সেই অশ্লীল ব্যাপার হইলে, তাঁহাদের পূজার ও ধ্যানের জিনিষ! দেবতার পূজার উদ্দেশ্য — তাঁহার মূর্ত্তির ধ্যান হইতে ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ে সঞ্চারিত করা। শিবমূর্ত্তির ধ্যানে অবশ্যই ঐ ভাবে আত্মা প্রভাবান্বিত হইতে পারে, কিন্তু যোনিসংযুক্ত লিঙ্গমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিলে তদ্দ্বারা যে কি লাভ হয়, আমরা তা বুঝিতে পারি না। আবার শিব-লিঙ্গ সম্মুখে রাখিয়া—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং * * পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ শ্লোক পাঠ করিয়া, পূজক যখন ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন ঐ লিঙ্গ-মূর্ত্তির সহিত ধ্যানের বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্য থাকে কি? উপাসনার বেলায় এইরূপে মস্তক ও নেত্রহীন লিঙ্গ-চিহ্নকে পঞ্চমুখ ও ত্রিনেত্র বলিয়া মিথ্যা বাগাড়ম্বর করা কিরূপ ধর্ম্ম, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। এসব কুসংস্কার বাদ দিয়া মহাদেবের ত্যাগ-বৈরাগ্যময় মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া পূজা ও ধ্যান করিলে শ্লোকেরও সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, এবং হৃদয়ে ঐ মূর্ত্তি-পরিস্ফুট মহাভাব

সংস্কৃত শ্লোকের আবরণে ঐরূপ অশ্লীল ঘটনাও যখন সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া সমাজে গৃহীত হইতেছে, উহা না মানিলেই যখন অধার্ম্মিক হইতে হয়, তখন ঐরূপ অন্ধ-গোঁড়ামীপূর্ণ কুসংস্কার হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ গুলিখোরী শাস্ত্রসমূহ ভস্মীভূত করা কি কল্যাণকর নহে?

জটিল শাস্ত্রবাক্য হইতে মহাজনের পথ শ্রেষ্ঠ

যাঁহারা মুখে মুখে ঐরূপ যাবতীয় শাস্ত্রেরই দোহাই দেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ কয়খানা শাস্ত্রের মত অনুসরণ করিয়া চলেন বলিতে পারি না। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, স্মৃতি ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ বহু প্রকারের বহুমতের সমর্থক। ঐ বিরুদ্ধ নানামত হইতে প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব নিবর্বাচন অতীব কঠিন ব্যাপার। তাই এ সম্বন্ধে মহাভারত বলেন,—যখন নানা মনগড়া শাস্ত্রে, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মূল উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, তখন ঐ সব নানামতের নানাশাস্ত্রের বেড়াজালে স্বয়ং ধর্ম্ম একেবারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া নিজের মুখ বন্ধ করতঃ বকরূপ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন; এবং জীবের কল্যাণের জন্য মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের মুখে কৌশলে প্রশ্নোত্তর ভাবে পাণ্ডিত্যের কূটজাল-দুষ্ট শাস্ত্রসমূহকে মানিতে নিষেধ করিয়া স্বীয় মন্তব্য নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিলেন,—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং॥

সঞ্চারিত হইয়া আত্মাকে মুক্তির পথে উন্নীত করিতে পারে। আমরা কুসংস্কার বাদ দিয়া এইভাবে শিব-পূজা করিতেই অনুরোধ জানাইতেছি।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা॥

ধর্ম্ম বলিতেছেন ঃ—বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়া থাকে। নানা মুনিরও নানামত। এমন মুনি নাই, যাঁহার মত ভিন্ন নয়। সুতরাং বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতের নানা শাস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার উপায় নাই। অতএব ঐ সমস্ত বর্জ্জন করিয়া মহাপুরুষগণ যে পথে গমন করেন, সেই আদর্শ ও মহাবাণীই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয় পথস্বরূপ গ্রহণ করিবে।

ভ্রাতৃগণ! শাস্ত্রের জটিল কূটজালে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব আচ্ছন্ন দেখিয়া স্বয়ং ধর্ম্ম উহা দ্বারা কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয় করিতে নিষেধ করতঃ যে মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহাই কি মায়ামুগ্ধ কলির জীবের পক্ষে একমাত্র সর্ব্ববাদী-সম্মত উপযুক্ত পথ নয়? আমরা বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্ত পন্থা নির্ণয় করিবার জন্য মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মের মহাবাণী অনুসারে মহাজনের অনুগমন করাই আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা ও স্বদেশ-রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করি।

মহত্মা গান্ধী বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ববাদীসম্মত মহাপুরুষ। আজ সমস্ত পৃথিবী মহাত্মাজীর মহানুভবতাময় মহাবাণী ভগবৎ-বাক্যের ন্যায় গুরুত্ব-পূর্ণ মনে করিয়া থাকেন। আমরা যতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই না কেন, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষ আমাদের ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমরা যে মহাভাগ্যবান্

তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব বর্ত্তমানে আমাদের কর্ম্ম-পন্থা নির্ব্বাচনে মহাত্মাজীর মহান্ আদর্শ ও মহাবাণী-গ্রহণই যে পরম মঙ্গল, এবং উহার উপেক্ষায় যে আত্মহত্যা ও সমাজধ্বংস, ইহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মহাত্মাজীর মহাবাণী, আমাদের অন্যানা যাবতীয় মহাপুরুষ ও অবতার-পুরুষের সহিত সম্পূর্ণ অবিরোধী। কলি-পাবন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মত ও পথ, এবং শ্রীমৎ-স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের মত ও পথ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বা জাতীয় জীবন-গঠন আন্দোলনে সকলেরই প্রাণপণ-চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ আবশ্যক।

ভ্রাতৃগণ! আমরা এপর্য্যন্ত বহু ভুল করিয়াছি, অভিমানের পদাঘাতে বহু মঙ্গলঘট বিচূর্ণ করিয়াছি, আর সময় নাই, সহোদর ভাইদিগকে ভাই বলিয়া বুকে তুলিয়া না লইলে আর মান ও প্রাণ বাঁচাইবার উপায় নাই। আমাদের বলক্ষয়ের জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণের পর্য্যন্ত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, এ যুদ্ধে জয়লাভ করা একমাত্র মহাত্মাজীর নেতৃত্বেই সম্ভবপর হইবে। এই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনই জাতীয় জীবনের ভিত্তি, কেননা উহার ভিতরেই জাতির একতা ও ধর্ম্মের মহাপ্রাণতার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। আসুন ভ্রাতৃগণ! আমরা জাতি ও ধর্ম্মকে একই বিশ্বজনীন উদার সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হই।

দ্বিতীয় স্তবক

গোঁড়ামীর কুফল ও সংস্কার প্রচেষ্টা।

পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সত্যযুগে মানুষ সব একবর্ণ ছিল এবং ত্রেতাযুগে তাহাদের বর্ণ-বিভাগ আরম্ভ হয়। ঐ বর্ণ-বিভাগ পরবর্ত্তী সময়ে জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বংশানুক্রমিক গণ্ডীবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে আভিজাত্যের সহিত শ্রমিক এবং সেবক-সঙ্ঘের বিভেদ ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার সৃষ্টি করিতে থাকে। বৌদ্ধ-প্লাবনের শেষভাগে ষষ্ঠ বা ৭ম খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া যখন দেখিলেন, সহস্র-বৎসরকাল প্রায় সমস্ত ভারতের অধিকাংশ হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির পথে চলিতে চলিতে বেদ, পুরাণ, ভাগবৎ ও গীতা-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তখন তিনি কুমারিলভট্ট প্রভৃতির সাহায্যে আপনার অমানুষিক প্রতিভা ও অধ্যবসায়-প্রভাবে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিলেন। সহস্রবৎসর পরে শঙ্করাচার্য্যের কৃপায় হিন্দু-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল বলিলেই হয়, বৌদ্ধগণ ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-নূতন নূতন বর্ণাশ্রমের বা নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি করিলেন। এইভাবে ভারতময় হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠায় বৈদিক যুগের ন্যায় পরম উদার ঋষি ও ব্রহ্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ইতিহাস বলে, এ সময়ে বাঙ্গলায় মাত্র পরাশর ও অণিক নামক

কতিপয় পতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। এমন কি তাহার পরবর্ত্তী কালেও আদিশূর সমস্ত বঙ্গদেশে যজ্ঞ করিবার উপযোগী ব্রাহ্মণ না পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনাতে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, এই আদিশূরের সেনবংশও বৌদ্ধযুগের হাজার বৎসরকাল উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অভাবে সম্পূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডশূন্য ছিলেন, অথবা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। এইরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের ফলে বৌদ্ধযুগের পর হইতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের ভিতরে ধর্ম্মটা নামমাত্র পর্য্যবসিত থাকাতে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে সমাজে স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা, ভেদনীতি ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার খুব দৃঢ় হইতে আরম্ভ হইল। উপযুক্ত সত্ত্বগুণের অভাবে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন নেতাগণ পৌরোহিত্য ও গুরুগিরি জীবিকার উপায়স্বরূপে গ্রহণ করিলেন—যাহার প্রভাব বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল সঙ্কীর্ণতা ও ভেদনীতি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দুর্ভাগ্যের অন্ধকার-রজনী আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল! গজনীর মুসলমান রাজাগণ এদেশে রাজ্য-স্থাপনে ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন! তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রচারের এমনই সুবিধা হইল যে হিন্দুদের টিকি কাটিয়া যা' তা' কিছু মুখে ঘসিয়া দিয়া বলিলেই হইল যে, তোমাকে গোমাংস খাওয়াইয়া দিলাম! আর যায় কোথা? অমনি নেতাগণ স্মৃতিশাস্ত্র খুলিয়া বলিলেন,—তোমার জা'ত গিয়াছে, তুষানলে দগ্ধ হওয়া তোমার প্রায়শ্চিত্তের

ব্যবস্থা! নিরপরাধ বেচারী তুষানলে প্রাণ-ত্য
মুসলমান হইয়া প্রাণ-রক্ষাই শ্রেয়ঃ মনে করা
মুসলমান হইয়া গেল! অধঃপতিত সমাজের নে
শুধু বিয়োগ করিতে শিখিয়াছিলেন, যোগ করিতে
ভাগ করিতে শিখিয়াছিলেন, পূরণ করিতে শিখেন ন
নানা উপায়ে বিয়োগ ও ভাগ করিতে করিতে সমা
দুর্ব্বল ও হীন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন!

এইরূপ সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম বিপ্লবের স্রোত চলিতে
মধ্যে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ
হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্মের সম্মুখে নূতন আদর্শ ও নূতন
আসিয়া ইহাকে নূতন ভাব-ধারায় নূতন পথে চালাইতে অ
করিতে লাগিল! ফলে স্মার্ত্তদিগের বর্জ্জনের কাজ বাড়িয়া চলি

মুসলমানগণের ফেরেস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদে
এদেশে আগমনের সময়ে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর সংখ
ছিল ৬০ কোটী। গত সাতশত বৎসরে ৩৬ কোটী বাদ
গিয়া এখন ২৪ কোটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ৬০ বৎসর
পূর্ব্বে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাংলার হিন্দু ছিল, মুসলমান অপেক্ষা
৪ লক্ষ বেশী, আর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের গ
পাওয়া যায়,—হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৫৭ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে!
কথায় কথায় হিন্দুর জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়, আর অমনি ক্ষীয়মান
জমা হইতে অবিরতই খরচ লেখা হয়! এইভাবে হিন্দু-জাতি
ক্রমে ক্রমে যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ

দেখিয়াও নেতাগণ
সিঞ্চনে মৃত-জাতির
উপর অবিরত খাও
বলিব ? নানাপ্রক
রক্ষা করিয়া সমা
তাঁহারা আদর
াছে ধোপা
াবেদন নি
হণ ব
াইতেছে
কি

উদারতা ও মহাপ্রাণতার মৃতসঞ্জীবনী-
প্রাণ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইলেন না, বরং মরার
ার ঘা দিতেই লাগিলেন! দুঃখের কথা কত
ার বর্জ্জনের পরেও যাঁহারা নিজেদের হিন্দুত্ব
জের অবিচারে হীনভাবে দিন কাটাইতেছিলেন,
। যত্ন পাওয়া দূরে থাকুক, আমাদের কর্ত্তাদের
, নাপিত ও বেহারা পর্য্যন্ত চাহিয়া পান নাই, বহু
দনের পরে মনের দুঃখে শেষে খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান-
রিয়া উপেক্ষা ও নির্য্যাতনের মনস্তাপ জুড়াইয়াছেন ও
ন! তবুও নেতাদের গোঁড়ামী দূর হয় নাই!
পরিতাপ! যতদিন ইঁহারা হিন্দু ছিলেন, হিন্দুর
ার উপাসনা করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণকে
র মত ভক্তি করিয়াছেন, ততদিন ইঁহাদের প্রার্থনায়
াত করা হয় নাই! আর যখন হ'তে তাঁহারা ধর্ম্মান্তর
। করিয়া হিন্দুর নিষিদ্ধ গো-মাংসাদি ব্যবহার করিতে
গিলেন, তখন হ'তেই তাঁহারা অযাচিতভাবে পূর্ব্ব প্রার্থিত
পা, নাপিত ও বেহারা পাইলেন! এবং উচ্চবর্ণের
ণও তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া মিলিয়া
মিশিয়া চলিতে লাগিলেন! আজ আমাদের উপেক্ষিত ভাই
সব খ্রীষ্টান ও মুসলমানবেশে আমাদের কাছে আসিয়া উপেক্ষার
পরিবর্ত্তে সম্মান পাইতেছেন! উপেক্ষিত ছিলেন ততদিন—
যতদিন তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়া উচ্চবর্ণের পদানত ছিলেন! হায়

মোহ! জাতীয় পতনের সঙ্গে সঙ্গে তুমি মানুষকে এমন করিয়াই বিচার-শক্তি বর্জ্জিত করিয়া রাখ, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত কালেও সম্ভব হয় না!!

শুধু এই পর্য্যন্তই নহে, অন্য দিকে যাঁহারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পারদর্শী, দেশের ও জাতির চক্ষু-স্বরূপ, সেই বিলাত-ফেরৎ জ্ঞানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যেরূপ নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিয়া জাতিকে হীন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে কা'র প্রাণ না ব্যথিত হয়? পূর্ব্বে কিন্তু স্বাধীন ভারতে সমুদ্র-যাত্রা করিয়া চীন, জাপান, সুমাত্রা, যাবা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে বহির্ব্বাণিজ্য করার দরুণ, কেহ জাতিচ্যুত হইতেন না; আর পতিত ভারতের অন্ধ-গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের ফলে জাতি ও দেশ-ধ্বংসকারী ঐরূপ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে সম্ভবপর হইয়াছে! নেতাদের গোঁড়ামীর ফলে বিলাত-ফেরৎ উচ্চবর্ণের হিন্দুগণও নিম্নবর্ণের মতই মনের দুঃখে খ্রীষ্টান হইতে বাধ্য হইয়াছেন!

ঐরূপ বর্জ্জন ব্যবস্থার জন্য নেতৃসমাজ দায়ী হইলেও তৎকালে তাঁহারা সঙ্কীর্ণতা ও বংশাভিমানের মোহবশতঃ হিত হিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজেরাই যেরূপ ভীষণ অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া আত্মঘাতী হইতেছিলেন, সে দুঃখভরা মোহময় করুণকাহিনী শ্রবণ করিলে সকলেই বোধ হয় দুঃখিত ও করুণার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ঐ দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিবেন, সন্দেহ নাই। হায়! অভিমানরূপ মহাপাপ মানুষকে ভীষণ

নরকাভিনয়ে লিপ্ত করিয়াও যেভাবে তাহাদিগকে সুখের আলেয়ার আলোতে স্বর্গবাসের ভ্রান্তিতে ডুবাইয়া রাখে, তাহা পরিস্ফুট করিয়া আত্ম-শোধন ও চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণতার গোঁড়ামীর চিত্রটী একান্ত কর্ত্তব্যের প্রেরণায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। কেন না মানুষের ভ্রম-প্রমাদ ও আত্ম-কৃত অন্যায়ের চিত্রটী সম্মুখে ধরিলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার আত্ম-শোধন ও আত্মোৎকর্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে।

একদিন নেতৃ-সমাজে এমন দিন গিয়াছে, যখন তাঁহাদের ভিতরে অভিমান ঢুকিতে ঢুকিতে উহার গোঁড়ামীর অন্ধতায় প্রত্যেকেই আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং সর্ব্বসাধারণ হইতে স্বীয় পার্থক্য ও বিশেষত্ব রক্ষার জন্য মোহের মাদকতায় আপন আপন মায়া-মমতা ও স্নেহের পুতুল কন্যা-ভগিনী-দিগকে কৌলীন্যের চিতায় উঠাইয়া দিয়া মেল-বন্ধনের আগুনে যাবজ্জীবন জীবন্ত দগ্ধ করতঃ অম্লানবদনে সেই বীভৎস শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছেন! হায়! এমনই বংশাভিমানের মোহ যে, যিনি গুণে হয়ত ধীবররাজ! বয়সে হয়ত ঠাকুরদাদা! এবং অন্যদিকে যিনি—বিশ, পঞ্চাশ, একশ বা দেড়শ—বিবাহ করিয়া হিসাবের খাতাখানি গলঘণ্ট করতঃ ধর্ম্মের ষাঁড়ের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বংশ-গৌরব রক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, এইরূপ এক একটী কৌলিন্যের যূপকাষ্ঠে বহু কুলীন মহাশয় লক্ষ্মীস্বরূপিনী তনয়াদের জীবন, যৌবন, রূপ, গুণ ও মান-সম্ভ্রম বলিদান করিয়া বংশগৌরবে গৌর-বান্বিত হইতেন! এই কুপ্রথায় যাহাদের নামমাত্র বিবাহ হইত,

তাহাদের অনেককেই চির-বৈধব্যের দশায় পিত্রালয়ে বসিয়া বসিয়া অতিকষ্টে চিরজীবন কুল ভাজিয়া খাইতে হইত! ইহাতে অনেক কুলীন-কুলতিলকেরই মাতুলালয়ে জন্ম ও মাতুল-অন্নে মানুষ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না! ইহার বিষময় ফলে, তাহাদের অনেকেই চিরজীবনে পিতাকে পর্য্যন্ত কখনও দেখিতে পান নাই, কাহারও কাহারও সঙ্গে পিতার স্পৃশ্যতা পর্য্যন্তও ঘটে নাই! সেইজন্য টিয়াপাখীর রাধাকৃষ্ণনাম শিখিবার মত অনেক কুলীন-কুমারকেই পিতার নাম মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইত!! ইহাই হইল কৌলিন্যের বিবাহের ও বংশাভিমানের গৌরবময় পরিণাম!

শুধু এই পর্য্যন্তই নহে, অন্যদিকে যেখানে মেল-সম্মত বর জুটিত না, তথায় অনেক মেয়ের চিরজীবন বিবাহই হই না! আবার হঠাৎ মেলমত বর জুটিয়া গেলে কেহ বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহের নামে কোন যুবক বা কিশোর বয়স্কের গলায় বরমাল্য দান করিয়া পিতৃপুরুষের কুলের গৌরব রক্ষা করিতেন! উনিশ বৎসর বয়স্ক একটী বরের কাছে, চল্লিশ বৎসর বয়স্কা একটী, ত্রিশ বৎসর বয়স্কা একটী ও বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স্কা একটী,—এক বাড়ীরই তিনটী কন্যাকে একই লগ্নে উৎসর্গ করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ৩।৪ দিন পরে বরটী পলায়ন করিলেন; চির জীবনে আর এদিকে পদার্পণ করেন নাই। লেখনীর নীরবতাই সে সব শোচনীয় পরিণামের পূর্ণপ্রকাশক। বিবাহের নামে এইরূপ পৈশাচিক ব্যাপার নেতৃসমাজের বুকের উপর দিয়া অব্যাহত-

ভাবে চলিত; ইহার বিষাক্ত ফলের তিক্তাস্বাদনে কাহারও অরুচি বা চৈতন্যের সঞ্চার হইত না; মেল-বন্ধন ভঙ্গ করিয়া কেহই কুলের গৌরব হীন করিতে রাজি হইতেন না; তবে হৃদয়বান্ ও মনস্বীগণের কেহ কেহ ঐ কুপ্রথার ভীষণতাতে মর্ম্মাহত হইয়া কুল-ভঙ্গ করতঃ বংশজে পরিণত হইয়া নিজের ঘরে শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে।

পক্ষান্তরে কৌলিন্যের ঐ কুপ্রথার ফলে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনেকে পাত্রীর অভাবে বিবাহ না করিতে পারিয়া নানা জঘন্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন না তখন তাহা-দিগকে পাঁচ শ', সাত শ', হাজার ও দেড় হাজার টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত! এই জন্য অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিবাহ করিতেন, আবার যাঁহারা অর্থহীন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কষ্টে সৃষ্টে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া বিশ-পঞ্চাশ টাকা পণ দিয়া অজ্ঞাত কুলশীল যে কোন জাতি-সম্ভূতা 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন! ভরার মেয়ের ইতিহাসটা আজকাল অনেকেই হয়ত জানেন না, সেই জন্য নিম্নে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা যাইতেছে।—

যখন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বিবাহের পাত্রী দুর্ঘট হইয়া-ছিল, তখন এক শ্রেণীর ধূর্ত্ত লোক অর্থোপার্জ্জনের অভিনব ফন্দিতে—অবিচারে ডোম, মেথর, বুনা ও বাগ্দি প্রভৃতি যে কোন জাতি-সম্ভূত দরিদ্র ও অসহায় লোকের কন্যা যথাসম্ভব অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া এক এক নৌকায় পচিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ

বা ততোধিক পর্য্যন্ত ছাগল-ভেড়ার মত বোঝাই করতঃ স্থানে স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেখান হইতে যাহা নিতে পারিতেন, সেইরূপ রৌপ্য-খণ্ডের বিনিময়ে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" গ্রহণ করাইবার ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ রত্ন-বিক্রেতাদিগের গলায় যে এক গোছা করিয়া সূতা ঝুলান থাকিত, তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহারা কোন মেয়ের 'বাবা', কোন মেয়ের 'কাকা', কাহারও 'মামা' ইত্যাদি সাজিয়া বিবাহ দিয়া যাইতেন!! আমাদের নিজ গ্রামস্থ চার জন ব্রাহ্মণ ঐরূপ পাঁচটী ভরার মেয়ে বিবাহ করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনে প্রথমে যে বিবাহ করেন, সে মেয়েটী বয়ঃস্থা ছিলেন। বিবাহের পরেই তিনি প্রকাশ করেন,—পূর্ব্বে তাঁহার আরও ১০।১২ বা বিবাহ হইয়া গিয়াছে! যাঁহারা বিবাহ দিয়া গিয়াছিলে তাঁহারাই বোধ হয় ৭।৮ দিন পরে রাত্রে আসিয়া ইঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যান! স্ত্রী স্বস্থানে বা অন্য বিবাহার্থীর উদ্দেশ্যে গমন করিবার পর এই পতিত-পাবন স্বামী ঐ প্রজাপতিদের তহবিল হইতে আর একটি স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করেন! শুনিয়াছি, অন্য তিন্‌টী মেয়ের মধ্যে একটি কথায় কথায় তাঁহার পিতার তাঁতবুন ও নিজের 'নলি ভরার' যোগ্যতার কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন! ইহা ভিন্ন আমার একটি বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার পরিচিত কয়েকটি ব্রাহ্মণ 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ভাদ্র মাসের প্রখর রৌদ্র দেখিয়া কথায় কথায় হঠাৎ তাঁহার বাবার চামড়া শুকাইবার কথা বলিয়া

ফেলিয়াছিলেন, ইতি—ভরার মেয়ের মহাভারতের নমুনা ! *

যাঁহারা ঐরূপ ভরার মেয়ে বিবাহ করার উপযুক্ত অর্থও সংগ্রহ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা প্রায়ই যে কোন বর্ণ হইতে এক একটী উপসংযুক্তা-পত্নী গ্রহণ করতঃ প্রকাশ্যে সমাজের মাথার উপর পা দিয়া দিগ্বিজয় করিয়া জীবন কাটাইতেন ! একমাত্র কৌলীন্যের কুপ্রথায় ও বংশাভিমানের গোঁড়ামী হইতে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, উহার বিষময় ফল ভোগ করিয়াও অনেকেরই মোহ ভাঙ্গে নাই এবং চক্ষু ফোটে নাই, মেল-বন্ধনের কুসংস্কার উঠাইয়া দিয়া জ্ঞানবান্ ও গুণবান সুযোগ্যব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার প্রবৃত্তি হয় নাই ! ব্যভিচার ও অনাচার যতই হৌক না কেন, সকলই উপেক্ষিত হইত, সবই চক্ষে সহিত, একমাত্র বংশমর্য্যাদা রক্ষার মোহে !! একমাত্র মেল-বন্ধনের কুসংস্কার বজায় রাখিতে !!

যাঁহারা বংশাভিমানের গোড়ামীর ফলে, নিজেদের ভিতরে ঐ সব কুৎসিত পাপকে পবিত্র প্রথা বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ঐ শ্রেষ্ঠতারূপ বায়ু-বিকারের অন্ধ-গোঁড়ামী হইতে যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের উপর নানারূপ অপ্রীতিকর ব্যবস্থা ঘটিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে ঐ গোঁড়া নেতাগণ অমঙ্গলজনক সঙ্কীর্ণআচার-ব্যবহারগুলিকে এখনও সনাতন ধর্ম্ম বলিয়াই দৃঢ়ভাবে

* ভরার মেয়ের সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন সন্দেহ থাকে, তবে আমরা উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চান এবং অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া মোহের অভিযানে বদ্ধপরিকর হন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইঁহারা ধর্ম্ম জিনিষটা যে কি তাহা তত্বের দিক দিয়া মোটেই জানেন না, সুতরাং মানেন না এবং বুঝেনও না; শুধু স্বীয় প্রাধান্য রক্ষার অনুকূল কুসংস্কারগত আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিলেই 'ধর্ম্ম গেল' 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া চীৎকার করেন! মূলে সনাতন ধর্ম্মের শম, দম প্রভৃতির সঙ্গে যে ইঁহাদের অনেকের কখনও দেখা-শুনা ঘটে নাই, তাহা অভ্রান্ত সত্য।

আজ কোথায় জগতের সাম্য-মৈত্রীর দিনে আমরা নিজেদের গলদ দূর করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আদর্শে ছোট বড় ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া একতার সঞ্জীবনী-শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় জীবন গঠন করিব, আর বলিতে দুঃখ হয়, যাঁহারা মুচি-মুদ্দফরাস প্রভৃতি ভরার মেয়ের গর্ভে জন্মিয়াছেন, এবং অস্পৃশ্যগণের দয়া-দাক্ষিণ্যে যাঁহাদের জীবন, আমাদের পরিচিত এইরূপ দুই চার জন খাঁটি নির্জ্জলা ব্রাহ্মণও যখন অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের বিরোধী হইয়া লম্ফ-ঝম্প ও চীৎকার করেন, তখন সত্যসত্যই বড় দুঃখে আপন মনে হাসিতে হয় মনে হয়,—কোথায় সেই পরম উদার প্রাচীন-ঋষিযুগ! যেদিন গুণের পূজা ছিল, দুই হাত দুই পা বিশিষ্ট নরাকার দেহের পূজা ছিল না! তাই উদার ঋষিকণ্ঠে কর্ত্তাদের কাণে কাণে আবার বলিতে ইচ্ছা হয়,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্॥
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

এ পর্য্যন্ত আমরা একদেশদর্শী নেতাদিগের গোঁড়ামীপূর্ণ মতের সংশোধন-মানসে বড় দুঃখে উহার কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কেননা আজ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজ অনেক স্থলে ঐ গোঁড়ামীর বিষময় ফল অমৃতবোধে চোখ বুজিয়া উটের কাঁটা খাইবার মত চর্ব্বণ করিতেছেন!

যাহা হউক এক্ষণে এই তিক্ত আলোচনায় ইতি দিয়া উদার-নৈতিক নেতাদিগের সমাজ-সংস্কার বিষয়ে দুই একটী কথা নিবেদন করিতেছি যে, আজ দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ঋষি ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ জাতির কল্যাণের জন্য যেরূপ ভাবে মানবতার পূজার ভিতর দিয়া অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, নিম্নবর্ণের উন্নয়ন ও জাতীয়-জীবন-গঠন ব্যাপারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; যেরূপ ভাবে দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া সমাজ-সংস্কারে ও নবযুগের মহাউদ্ধারণ ভাব-ধারায় হিন্দুজাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন; আমরা আশা করি হিন্দু ভ্রাতৃগণ আজ ঐ মহানুভব ব্রাহ্মণ ও ঋষি সমাজের নেতৃত্বের মহাবাণী ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে বৈদিক ঋষি-যুগের উদারতা ও গুণ-গ্রাহিতা প্রভাবে জাতীয় জীবন গঠন করিয়া ধন্য হইবেন।

সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে উদার সাম্য-মৈত্রীময় ভাব-ধারা ঢালিয়া জগতের সম্মুখে হিন্দুধর্ম্মের মহাপ্রাণতার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই বিশ্বজনীন প্রেমের স্রোত ক্রমেই প্লাবনেরতরঙ্গে দেশকে আন্দোলিত করিয়া অহিংস অমৃতত্বের খবর দিতেছে।

আজ মহাত্মাগান্ধী-প্রমুখ সহস্র সহস্র মহা-মানব, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও ঋষি ঐ মহাস্রোতের ভাব-ধারা দেশময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঢালিয়া দিয়া মহাপ্রভুর সেই মহা উদ্ধারণব্রত উদ্‌যাপনেরই চেষ্টা করিতেছেন! ঐ মহাব্রত-উদ্‌যাপনকারী ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরম নৈষ্ঠিক পণ্ডিত-প্রবর মদনমোহন মালব্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহাপণ্ডিত—স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য (পূর্ব্ব আশ্রমস্থ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি·এ, হেড্‌মাষ্টার বালিয়াকান্দি হাই স্কুল), পণ্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত দীনবন্ধু গোস্বামী ভাগবতরত্ন, অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক পণ্ডিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, রায়সাহেব শ্রীশ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত যতীন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ, সার পি·সি রায়, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, মহাপ্রাণ পদ্মরাজ জৈন, পণ্ডিত রাজাগোপালাচারী, স্বামীবিবেকানন্দ-প্রমুখ ত্যাগী-মনীষী-বৃন্দ (রামকৃষ্ণমিশন), স্বামী সত্যানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসী-বৃন্দ (হিন্দু-মিশন), স্বামী দয়ানন্দসরস্বতী-প্রমুখ ঋষিবৃন্দ (আর্য্যমিশন), প্রভু জগদ্বন্ধু-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-প্রমুখ ভক্ত ও কর্ম্মীবৃন্দ, ঠাকুর জ্ঞানানন্দ অবধূত-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, ঠাকুর কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিমলা-প্রসাদ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ (গৌরীয় মঠ), এবং ইহা ভিন্ন যোগীশ্রেষ্ঠ অরবিন্দ, দয়ানন্দ, ভোলাগিরি, হরনাথ, গম্ভীরানাথ,

চরণদাস-বাবাজী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রমুখ আরও অগণিত ভক্ত, ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক-উন্নতি, সমাজ-সংস্কার, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, নিম্নবর্ণের উন্নয়ন, ও সাম্য-মৈত্রীময় জাতীয় জীবন গঠনের জন্য যে ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, ঐ মহাপ্রাণ মনীষী নেতৃ-সমাজের মহাবাক্য ও মহান্ আদর্শ লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাতৃভূমির গৌরব রক্ষাকরা হিন্দু-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আজ সময় আসিয়াছে, তাই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন অগণিত ব্রাহ্মণ ও তত্ত্বদর্শী ঋষি আসিয়া হিন্দুর দ্বারে দ্বারে সংস্কারের বার্ত্তা বহন করিয়া বেড়াইতেছেন ও আদর্শ দেখাইতেছেন। ভ্রাতৃগণ উঠ জাগ! হেলায় এই ভগবৎ-প্রেরিত শুভ-মাহেন্দ্রক্ষণ পরিত্যাগ করিও না, এবার সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। মনে রাখিও,—যে জাতি সহস্র সহস্র বৎসরের পেষণেও ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই, সে জাতি শুধু মরিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করে নাই, তাঁহাদের অনেক কিছু করিবার আছে, আপনাদের অমৃতত্বের আস্বাদনে জগতের তিক্ততা দূর করিবার ভার তাঁহাদেরই উপরে। তোমরা তোমাদের ঋষিযুগের উদারতা ও মহাপ্রাণতা লইয়া জাগিয়া উঠ; তোমাদের অমরতা দিয়া জগতের মরণ ঘুচাইয়া দেও। ওঁ প্রেম! আনন্দ!! শান্তি!!!

হিন্দুধর্ম্মে অধিকার কাহার?

আমরা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুমাত্রেরই অধিকার, না কি উহাতে কোন সম্প্রদায় বিশেষরই উত্তরাধিকারসূত্রে কায়েমী করা অধিকার? যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে শুধু নিজেদের ব্যবসার বা প্রাধান্য রক্ষার রক্ষাকবচ মনে করেন; যাঁহারা আপনাদিগকেই একমাত্র হিন্দু মনে করিয়া অন্যান্য যাবতীয় হিন্দুকে উহার অধিকারের বাহিরে হেয়, নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জীব বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে বলি,—হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের গোড়ায় মূল বেদীতে আচার্য্য-রূপে বসিয়া আছেন কাহারা? কাহাদের আদেশ, উপদেশ ও ভাব-বাণী পবিত্র হিন্দুশাস্ত্ররূপে মাথায় করিয়া এবং কাহাদের চরণরেণুর স্পর্শে ধন্য হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া গৌরব করিতেছেন? কাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমায় হিন্দুধর্ম্ম আজ সমস্ত জগতের মনীষীদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের খবর দিয়া স্তম্ভিত ও বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছে?

হে অভিমানী ভ্রাতৃগণ! আপনারা একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুন,—আপনাদের ধর্ম্মের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদীতে অনন্ত অক্ষয় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, একজন—ধীবর কন্যার গর্ভজাত ব্যাস, একজন—নমশূদ্রার গর্ভজাত পরাশর, একজন—বেশ্যাগর্ভজাত বশিষ্ঠ, একজন—দাসীগর্ভজাত নারদ, একজন—শূদ্রার গর্ভজাত শুকদেব, একজন—সূতবংশ-জাত সৌতি, নহেন কি? ইঁহারাই কি আপনাদের সনাতন ধর্ম্মের কর্ণধার নহেন?

যে ধর্ম্মের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গোড়ায় রহিয়াছেন উল্লিখিত নিম্ন-স্থানজাত ঋষিগণ, সে ধর্ম্মে কোন্ বর্ণ নীচ ও কোন্ বর্ণ অস্পৃশ্য, আমরা ত তাহা খুজিয়া পাই না, বরং আমরা হিন্দুধর্ম্মের এই পরম উদার ভাবকেই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের নিকট শ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয় মনে করি। আমরা অভিমানী ভাইদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে,—হিন্দুসমাজ যদি বংশানু-ক্রমিক বর্ণবিভাগ লইয়াই ব্যবস্থিত হইত, যদি উহাতে শুধু উচ্চবর্ণেরই একাধিপত্য থাকিত, তবে নিম্ন বর্ণ হইতে ঐ সমস্ত লোক সমাজের শীর্ষস্থানে ঋষিপদে উন্নীত হইলেন কেমন করিয়া? ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কি উদার হিন্দুধর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার ঘোষণা করিতেছে না? সকলের সম অধিকার ছিল বলিয়াই আজ অবিচারে যাকে তাকে ধর্ম্মের মূলভিত্তিতেঃআচার্য্যপদে সমাসীন দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে যেরূপ অন্ধ-গোঁড়ামীর পূজা প্রচলিত, পূর্ব্বে এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব থাকিলে কি কখনও ঐরূপ ব্যাপার সম্ভব হইতে পারিত?

অনেকে বংশগৌরবে ধর্ম্মের একাধিপত্য দাবী করিয়া মনুসংহিতার দোহাই দেন। কিন্তু মনু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গুণগত অধিকারেই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ॥

মনু বলিয়াছেন, মানুষমাত্রই জাত (ভূমিষ্ঠ) অবস্থায়, দৈহিক

ও মানসিক অপূর্ণতাবশতঃ শূদ্র অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞ থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা মনের সংস্কার (আত্মিক-বিকাশ) হইতে থাকে তখন তাহার দ্বিজত্ব লাভ (দ্বিতীয় জন্মরূপ নূতন জীবন গঠন) হয়। অতঃপর বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ হইলে হয় বিপ্র, এবং ধ্যানধারণাদি দ্বারা আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, বা ব্রহ্মকে জানিতে পারে তখন সে হয় ব্রাহ্মণ। সর্ব্বভূতে (স্থাবর-জঙ্গমে) ব্রহ্মদর্শনই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচায়ক। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ভেদবুদ্ধি বা ছোটবড় জ্ঞান থাকে না, বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান হয়; এই ব্রহ্মভাব লাভ সাধনার শেষ ফল। আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারাই মানুষ ঋষিত্ব লাভ করিয়া মনুষ্যত্বের ঐ চরম অবস্থায় উন্নীত হয়, বংশ গৌরব হইতে কেহই ব্রহ্মজ্ঞঋষি হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, "সকলেই জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" একথা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব হিন্দুধর্ম্মে ঋষিযুগ হইতেই যে গুণানুসারে প্রত্যেকের শূদ্রত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, মনুসংহিতায় ও ইহা জ্বলন্ত দীপ্যমান। অতএব হিন্দুধর্ম্মে সকলের সমান অধিকার আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?
উহার অধিকারী কে ?

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষহ্রীক্ষমার্জ্জবং।
জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষঃ ধর্ম্ম সনাতনঃ॥ (ব্যাস সংহিতা।)

সত্য, শম, দম, শৌচ, সন্তোষ, লজ্জা, ক্ষমা, দয়া, সরলতা, জ্ঞান ও ধ্যান প্রভৃতি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গুণ। এই সমস্ত গুণ কি হিন্দুমাত্রেরই আদর্শস্থানীয় নয়? ব্যাসদেব কি উহা সমস্ত হিন্দুসমাজের জন্য বিধিবদ্ধ করেন নাই? সমগ্র হিন্দুসমাজেরই কি ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান একমাত্র কর্ত্তব্য নয়? যাবতীয় হিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মের ঐ মূল নীতিতে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা না করিলে কি সমাজের নেতার কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয় না? কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, নেতৃমণ্ডলী অনেক হিন্দুকে তাহার ধর্ম্মের উন্নত স্তরে তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা না করিয়া তাঁহাদিগকে অধিকারের বাহিরে নির্য্যাতিত, অস্পৃশ্য ও অহিন্দুর মত করিয়া রাখিয়া কর্ত্তব্য-ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে গৌরবান্বিতই বোধ করিতেছেন! তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এমনই পতন ঘটিয়াছে যে, ভুল দেখাইয়া দিলেও ভ্রমসংশোধন করিতে রাজী নহেন। ইঁহারা একবারও মনে করেন না যে,—হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ,দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ, ভাগবত ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ কোন একটা অজ্ঞতা, মূর্খতা ও সংকীর্ণতা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। বাস্তবিকই ঐ পরম উদার হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বজনীন প্রেমের নির্ঝর ভিন্ন কোথাও অভিমান ও সঙ্কীর্ণতামূলক

নিপীড়ণ-নীতির সমর্থন নাই। বরং বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি সর্ব্বভূতে এক ব্রহ্মেরই বিকাশ জানাইয়া সকলকে শ্রদ্ধা করিবারই উপদেশ দিয়াছে; ধর্ম্মে কাহাকেও একচেটিয়া অধিকার দিয়া অবশিষ্ট সকলকে অধিকারের বাহিরে স্থান দানের ব্যবস্থা করে নাই। সুতরাং সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে সকল হিন্দুরই সমান অধিকার আছে। অন্যদিকে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে উপেক্ষিত নিম্নবর্ণের ভিতরে সরলতা, ও ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয়,—উচ্চবর্ণের অভিমান, কুটিলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি দেখিয়াই ধর্ম্ম যেন নিম্নবর্ণের ভিতরে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন; তাঁহারাই যেন প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের অধিকারী।

উপসংহারে আমার বংশাভিমানী সনাতনী ভাইদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা এমন সম্মানের উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিশিখরে বসিয়া জেলেনীর ছেলের পরিকল্পিত ব্যাস-সংহিতার "এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" শ্লোকটি আওড়াইতে কি সম্মানের, লাঘব ও লজ্জা বোধ করেন না ? যদি তাই না করেন, তবে অস্পৃশ্যশব্দ উচ্চারণ করিয়া আর অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে যান কে?

সনাতন ধর্ম্ম কি চির অপরিবর্ত্তনীয় ?

যাঁহারা সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মকে অপরিবর্ত্তনশীল একটা অচলায়তন মনে করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, আত্মিক বিকাশের উপায়-স্বরূপ হিন্দুধর্ম্মের নিত্যসত্য মূল নীতি শম, দম, ও ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও উহাতে পৌঁছিবার ও সংসার-

যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সামাজিক রীতিনীতি ও আচারব্যবহার প্রভৃতি অপরিবর্ত্তনীয় নহে। বরং প্রাচীন ঋষিযুগ হইতে মূল-নীতিকে রক্ষা করিবার জন্য উহা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে বহু বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াই বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এই পরিবর্ত্তনশীলতার বাস্তব-ব্যাপারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে,—

১। সত্যযুগে সমস্ত হিন্দু ছিল একবর্ণ; ত্রেতাযুগে হয় চতুর্ব্বর্ণ; ক্রমে ঐ চতুর্ব্বর্ণ কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকার গণ্ডীবদ্ধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের গণনায় হিন্দুজাতির সংখ্যা হইয়াছে,—দুই হাজার সাতশত তিরাশি। আজ হিন্দুর চতুর্ব্বর্ণ কোথায়? সনাতনী ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

২। পূর্ব্বে চতুর্ব্বর্ণের পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় হিন্দু স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে শুধু শূদ্র-বৃত্তি দাসত্ব ও বৈশ্য-বৃত্তি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। সনাতনী ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি ঠিক ঠিক স্বীয়-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, না কি তাহাদের বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? পদস্থ-কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ীদিগের কথা বাদ দিয়া পাচক, পূজারি ও মন্দিরের সেবাইত ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে,—স্থানে স্থানে তাঁহাদিগের ভিতরে এমন সব মদ-গাঁজাখোর, চরিত্র-হীন ও ব্যভিচারী ব্যক্তি বর্ত্তমান, যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিলে জগতে অব্রাহ্মণ বলিয়া কেহই থাকে না। সমাজের

এইরূপ হীন বিবর্ত্তন হজম করিবার সঙ্গে সঙ্গে কি সনাতনী ভ্রাতাগণ মানব-জাতিকে "সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ" বোধে গোঁড়ামীটা বাদ দিয়া সকলের প্রতিই ঐরূপ উদার ব্যবহার করিতে পারেন না?

৩। প্রাচীন হিন্দুসমাজে ঋগ্বেদের নির্দ্দেশ–অনুসারে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবতার বা ভগবৎ-বিভূতির উপাসনা, এবং অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় প্রভৃতি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। বর্ত্তমানে ঐ সব পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে কি অগ্নি-হোত্রাদির স্থান পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পূজা-পার্ব্বণে অধিকার করে নাই? মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদের ব্রহ্ম-উপাসনা কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে? আমার সনাতনী ভ্রাতাগণ কি হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে এসব পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন না?

৪। হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপক শাস্ত্রও যে বহু বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? উহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করা যাইতেছে,—

"কৃতেতু মানবঃ প্রোক্তস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ।"

আবার আগম বলেন,—

"কৃতে শ্রুত্যুদিতো মার্গস্ত্রেতায়াং স্মৃতি চোদিতঃ।
দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্ভবঃ।"

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও আগম প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সর্ব্বদা একই শাস্ত্র-নির্দ্দেশে ও একই নিয়মে সমাজ শাসিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে রঘুনন্দনের স্মৃতি অনুসারে বঙ্গদেশে সমাজ শাসিত হইতেছে। পূর্ব্বে গোবিন্দানন্দের স্মৃতি প্রচলিত ছিল। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দানন্দের মতটী খণ্ডণ করিয়া অনেক স্থানেই নিজ মত স্থাপন করাতে পূর্ব্ব নিয়ম বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের চতুর্ব্বর্ণের স্থানে পরবর্ত্তী স্মার্ত্তমহাশয় বঙ্গদেশে মাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুইটী বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুইটী শিক্ষিত জাতিকে বেদাচারে বর্জ্জিত শূদ্র বা অনার্য্যস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছেন! এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি প্রভৃতির ব্যবস্থায় সমাজের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সনাতনী ভ্রাতাগণ কি তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন? একবার চাহিয়া দেখুন—যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতি নামে যে স্মৃতি-গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহাতে বিশ জন স্মৃতিকারকের নাম আছে। বীরমিত্রদেব ৫০ জন স্মৃতিকারকের নাম করিয়াছেন। কমলাকর নির্ণয়-সিন্ধুতে ১৩১ জন স্মার্ত্তের নাম করিয়াছেন। সংস্কার-কৌস্তুভে অনন্ত-দেব ১০৪ জনের নাম করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অনেক স্মৃতির বচন দেখা যায়—যাহার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। এই-সব অসংখ্য স্মৃতি-শাস্ত্র সমাজ ও ধর্ম্মের উপর যে ভীষণ

কুসংস্কার ও নির্য্যাতন-নীতি চাপাইয়া দিয়া অকল্যাণ ঘটাইয়াছে, তাহা অতীব মারাত্মক। পণ্ডিত হইয়া যে সে ভাবের একখানা সংস্কৃত পুথি লিখিয়া স্মৃতি-শাস্ত্র নামে অন্ধ-সমাজের ঘারে, চাপাইয়া দেওয়া কঠিন ব্যাপার নহে। পণ্ডিত হইলেই যে তিনি মনীষী-ঋষি ও তত্ত্বদর্শী হইবেন তার মানে কি? সুতরাং বহু সঙ্কীর্ণ-চিত্ত লেখকের একদেশদর্শী নানাভাব সম্বলিত স্মৃতি-শাস্ত্র যে সঙ্কীর্ণতা দ্বারা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

৫। বেদই হিন্দুর মূল-ধর্ম্মশাস্ত্র। ঋষিযুগে সর্ব্ব-বর্ণেরই যে বেদে অধিকার ছিল, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সর্ব্ব-বর্ণের শুধু বেদে অধিকারই ছিল, তাহা নহে, ব্যাসদেবই বেদের কর্ত্তা ছিলেন। বেদের শৃঙ্খলা বা বিভাগ করিয়াই তাঁহার নাম হয় বেদব্যাস। সমাজের অধঃপতনের দিনে—বৌদ্ধ-যুগের পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থাপনের ফলে যখন ব্রাহ্মণদেরই বেদে একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইল, তখন হইতে অন্যান্য যাবতীয় হিন্দুই বেদে, বৈদিক ধর্ম্মে-কর্ম্মে, বৈদিক আচার-ব্যবহারে ও প্রণবমন্ত্রে অনধিকারী হওয়াতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গেল! অতঃপর সর্ব্ববর্ণে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা ও উপাসনা প্রচলিত হওয়াতে অধিকাংশ হিন্দুই দীক্ষা, উপাসনা ও পূজা-পার্ব্বণাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের আংশিক অধিকার লাভ করিল। সর্ব্ববর্ণের দীক্ষার অধিকার সম্বন্ধে তন্ত্র বলিতেছেন,—

"গতং শূদ্রস্য শূদ্রত্বং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিপ্রতা।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেতু সর্ব্বে শিব সমাঃ কিল॥"

মন্ত্রগ্রহণ দ্বারা শূদ্রের শূদ্রতা ও ব্রাহ্মণের বিপ্রতা তিরোহিত হইয়া উভয়েই শিবতুল্য হয়। দীক্ষা দ্বারা মানুষ শিবতুল্য পবিত্র হইলে, সমস্ত দেব-দেবীর পূজায়ই তাহাদের অধিকার জন্মে। এই জন্য ৺কালীপূজার প্রসঙ্গে তন্ত্র বলিতেছেন,—

বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্তাঃ দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে।
তে সর্ব্বে জন্তবো লোকে ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥

পৃথিবীতে বিপ্র হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত দ্বিপদ প্রাণী আছে, তাঁহারা সকলেই অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই এই কালীপূজার অধিকারী। তন্ত্রমতে কোন মানুষই কালীপূজায় অনধিকারী নন। বরং ইহা সকলেই জানেন যে, চণ্ডালের শবে কালী সাধনা করিলে, অতি সত্বর সিদ্ধিলাভ ঘটে অর্থাৎ মা কালী সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া বর দান করেন।*

বৈদিক যুগ হইতেই হিন্দুসমাজ এইভাবে নানা প্রকার বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে, এরমধ্যে বৈদান্তিক ব্রাহ্মণগণের শুষ্ক জ্ঞানমার্গের কদর্থে ও তান্ত্রিক উপাসকদিগের 'পঞ্চমকার' সাধনার আবিলতায় যখন সমাজে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের হানি ঘটিতেছিল, এবং হিংসা, দ্বেষ ও আভিজাত্যে যখন সমাজ নিপীড়িত হইতে বসিয়াছিল, তখন কলি-পাবন অবতার

* এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জগন্মাতা জগতকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সকল সন্তানকেই সমান ভালবাসিলেও অভিমানীগণ যাঁহাকে হীন মনে করেন, তিনি তাঁহাকেই অধিক স্নেহে বুকে ধারণ করেন!

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা উদার প্রেম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে আচণ্ডাল-যবনকে আপনার প্রেমের বুকে তুলিয়া লইলেন। মহাপ্রভুর বিশ্ব-জনীন উদার মতে আবার প্রাচীন ঋষিযুগের উদার ধর্ম্মভাবে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজকে জাগ্রত করিল। প্রেমময়ের প্রেমের ক্রোড়ে স্থান পাইয়া আভিজাত্যে নিপীড়িত হিন্দুসমাজ শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! এতদিন পরে পদ্মপুরাণের অমিয়-বাণী আবার সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল,—

'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি স্বপচাধমঃ ॥'

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হ'তেও শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম ; মহা প্রভুর কৃপায় ঐ সাম্যনীতি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিবশেষে সকলে—এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর প্রেমের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ জুড়াইল ! যবন হরিদাস, কবির ও কাজী প্রভৃতি মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া প্রেম-ভক্তির প্লাবণে ভরপূর হওয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল !

শুধু এই পর্য্যন্তই নহে, ইহার পর শ্রীমৎনরোত্তম [illegible], শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য ও শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জা[illegible]বর্ণ-নির্ব্বিবশেষে, ভক্তদিগের মধ্যে অবিচারে দীক্ষামন্ত্র দিয়া উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। শ্রীমৎ নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ হইলেও তাঁহার মহামানবতার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বহু ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত তাঁহার

নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করেন! এ সম্বন্ধে প্রেমবিলাস গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, অভিমানী ব্রাহ্মণগণ রাজা নরসিংহ রায়ের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করেন—যে,

কৃষ্ণানন্দ দত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস,
ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্ব্বনাস,

বল্লভাচার্য্য মুসলমানকে পর্য্যন্ত দীক্ষা দিতেন। তানসেন ও আলিখান নামক প্রধান বৈষ্ণবভক্তদ্বয় উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অতঃপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীমৎ-স্বামী বিবেকানন্দ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া সকলকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আধ্যাত্মিক পথে তুলিয়া লইবার ব্যবস্থায় হিন্দুসমাজে যুগান্তরের সূচনা করেন। এই ধর্ম্মপ্রবাহে প্রাচ্যের হিন্দুধর্ম্ম প্রতীচ্যে পর্য্যন্ত আদৃত হইতে থাকিল! এই মহাউদ্ধারণ যুগ-সন্ধিক্ষণে,—

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মহান্ উদার প্রেম-ভক্তির প্রভাব পুনঃ প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করেন। এই শুভ লগ্নে শ্রীমৎ প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ভারতী ও শ্রীমৎ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঐ নাম সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেমভক্তির ভাবধারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে অগ্রসর হন। ঠাকুর প্রেমানন্দ ভারতীর শুভ প্রচেষ্টায় এই বৈষ্ণবধর্ম্ম সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীমৎ ঠাকুর জ্ঞানানন্দদেব, শ্রীমৎ ঠাকুর গম্ভীরানাথ বাবা, শ্রীমৎ ঠাকুর

হরনাথ, শ্রীমৎ ঠাকুর দয়ানন্দ, শ্রীমৎ ঠাকুর ভোলা গিরি, শ্রীমৎ ঠাকুর অনুকূল প্রভৃতি মহাপুরুষগণ হিন্দু ধর্ম্মের উন্নয়নের দিক দিয়া নানাপ্রকার সংস্কার সাধন করিতে লাগিলেন। এইভাবে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মূল নীতিতে বা আধ্যাত্মিক উন্নতির উন্নততম সৌধে পৌঁছিবার জন্য যে ঋষিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা ভাবের সাধন-ভজন ও রীতিনীতির পরিবর্ত্তন ও প্রচলন হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা সনাতনী ভ্রাতাগণ কি স্বীকার করেন না ?

৬। ধর্ম্ম-জগতে ও কর্ম্ম-জগতে এইরূপে সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির যে অবিরত কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার আলোচনা করা অসম্ভব। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, দৈবত, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব্য, আসুর, পৈশাচ ও স্বয়ম্বর আট প্রকার বিবাহ-বিধান যে ক্রমে ক্রমে কি সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিতেছে, তাহা সনাতনী ভ্রাতাদিগকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। এক একটি বিবাহ-প্রথার কুফল সংস্কার করিতে যাওয়াতেই যে অন্য প্রকার বিবাহ বিধির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। এ সমস্ত পরিবর্ত্তন কি হিন্দু-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই ? আসুরিক বলপ্রয়োগে ও পৈশাচিক ভাবে বিবাহের ব্যবস্থাগুলি প্রচলিত থাকিলে কি সমাজের মঙ্গল হইত ? মধ্যযুগে ব্রাহ্মণগণ লোভী ও মূ[illegible] হইলে নিম্ন তিন বর্ণ হইতেই সুন্দরী কন্যা গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিতেন। সেইসব অসবর্ণ বিবাহের সন্তানগণ কি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব-পুরুষ নহেন ? আবার বর্ত্তমানে সবর্ণ ভিন্ন

বিবাহ প্রথা নাই, এসব কি সমাজের পরিবর্ত্তনশীলতার সাক্ষ্য নহে ?

৭। শ্বেতকেতু স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উহার পূর্ব্বের অবস্থা কাহারও অবিদিত নাই। ঐ প্রথার অত্যন্ত গোঁড়ামী হইতে ক্রমে সতী-দাহ প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। তৎপর ঐ পৈশাচিক প্রথা আইনের সাহায্যে নিবারিত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ প্রথাটি সমাজে চিরদিন একভাবে চলিতেছে ও চলা মঙ্গলজনক ?

৮। কৌলীন্য প্রথা চিরদিন সমাজে ছিল কি ? বল্লাল সেন হইতে ইহার প্রচলন হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের বাহিরে উহা বংশানুক্রমিক ভাবে প্রচলনের ফলে যে ভীষণ বিষময় ফল প্রসব করে, মনীষী-গণের চেষ্টায় আজ আবার উহার পরিবর্ত্তনে শান্তির-প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এসব বিবর্ত্তন সনাতনী ভ্রাতাগণ কি চক্ষে দেখেন না ?

৯। উপসংহারে সনাতনী ভাইদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও আইনের প্রভাবে হিন্দু সমাজ হইতে 'গঙ্গা-সাগরে সন্তান-নিক্ষেপ প্রথা' ও 'সতীদাহ প্রথা' উঠিয়া গিয়াছে, এ কৌলীন্যের বিষময় প্রথা ও বিলাত-ফেরতদিগের বর্জ্জন-[illegible] ও যে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এখন যে ঐ সব বিষয়ের লড়াই লইয়া পণ্ডিত মহাশয়দের শাস্ত্র কচ্‌কচি ও বর্জ্জন-বিষ ঢালিবার ফোঁস্‌ফোঁসানি শুনিতে পাওয়া যায় না, ইহা কি ভাল হইয়াছে, না মন্দ হইয়াছে ? যাঁহারা হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন স্বীকার

করেন না, এবং উহার নাম শুনিলেই জলাতঙ্ক রোগীর মত কামড়াইতে আসেন, তাঁহাদিগকে ত নিজের বাড়ীতে এখন জোর করিয়া পূর্ব্বের মত সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা চালাইতে দেখিতে পাই না ? এ সব যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজে অনেকটা শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তেমন সমস্ত হিন্দুকে তাঁহাদের ধর্ম্মের ন্যায্য অধিকারে অধিকার দিয়া উন্নয়নের পথে তুলিয়া লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় জীবন গঠনে সমাজে প্রকৃত শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, এবং অলীক অভিমানের 'আমি বড় তুমি ছোট', ও 'ভেদ-বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা' বিদূরিত করিয়া,—'ঈশ্বর সর্ব্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি'—হিন্দুধর্ম্মের এই মূলনীতিতে জীবন বিকাইয়া দিতে হইবে। পক্ষান্তরে পরিবারস্থ অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের শিক্ষা ও সংস্কার প্রভৃতির জন্য যেমন পরিবারের নেতা দায়ী, তেমন সমাজ-শরীরের নিম্ন-অঙ্গকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও সবল করিয়া স্বীয় অঙ্গীভূত করতঃ নিজকে ও নিজের জাতিকে পবিত্র ও সবল করা নেতারই প্রধানতম কর্ত্তব্য। আসুন ভ্রাতৃগণ! আমরা পৃথিবীর জাগরণের দিনে কুসংস্কারের মোহ-নিদ্রা বিদূরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গীতাধর্ম্মরূপ পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে,—

কাঁপায়ে মেদিনী করি জয়ধ্বনি,
জাগিয়ে উঠুক মৃতপ্রাণ।
ধরি বেদান্তের শিক্ষা লয়ে ঋষিদের দীক্ষা,
প্রাণের স্পৃশ্যতা দিয়ে গড়ি হিন্দুস্থান।

শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় আবার বলি,—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি-হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন-ব্রাহ্মণে, গোতে, হস্তীতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র তাঁহাদের সমজ্ঞান; তাঁহারা কাহাকেও বড় বা ছোট দেখেন না। আমরা মুখে মুখে পাণ্ডিত্যের বড়াই করিয়া যদি উক্ত শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা না করি,—যদি মোহবশতঃ ভেদবুদ্ধি লইয়া ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডালকে হীন মনে করি, তবে আমাদেরই পণ্ডার পরিবর্ত্তে নিকৃষ্টতারূপ নীল-চশমার স্বভাব ফুটিয়া বাহির হয় না কি?

দেবার্চ্চনায় ও মন্দিরে অধিকার কাহার?

জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা—প্রেমময় ভগবান। ভগবানের নিকট কোন জীবই ঘৃণ্য বা অস্পৃশ্য নহে। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সবই তাঁহার [illegible]র করে গঠিত ও প্রেমামৃতের তুলিকায় চিত্রিত। তিনি [illegible]র্শ দোষের ভয়ে দূরে থাকিয়া সৃষ্টির তুলিকাটি চালনা করেন নাই, এবং দূরে বসিয়া ঢিল ছুড়িবার মত কাহারও মুখে অন্নজল নিক্ষেপ করিতেছেন না। সেই হৃদয়ের দেবতা সকলকেই

আপনার অযাচিত করুণায় প্রেমের ক্রোড়ে রাখিয়া স্নেহের চুম্বনে পালন করিতেছেন। তাঁহারই অনন্ত প্রেম-পিযুষ-রাশি, তাঁহারই অনন্ত স্নেহ ও দয়ারাশি মাতৃবুকে স্তন্য এবং বায়ু, জল ও ফল-শস্যরূপ ধারণ করিয়া অনন্তকাল জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে! সেই প্রেমময় ধাতা ও পাতা অন্তরে প্রাণরূপে এবং বাহিরে প্রাণারামরূপে জ্বলন্ত দীপ্যমান ; চোখ খুলিয়া চাও, সেই প্রেমের মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ পাগল হইয়া যাইবে! এবং তাঁহার একই প্রেমের ক্রোড়ে সমস্ত সন্তানের সমাবেশ দেখিয়া, প্রত্যেক মানুষেই ভ্রাতা-বোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে ভেদবুদ্ধি বিলীন হইবে।

কি বলিতেছিলাম ? প্রেমময় ভগবান সবারই অন্তরে বাহিরে বিরাজিত, তিনি কাহারও অন্তর হ'তে দূরে নন। তাঁহার নিকট কেহ প্রিয় এবং কেহ অপ্রিয় নয় ; তাই গীতায় বলিয়াছেন,—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।' বাস্তবিকই ভগবানের নিকট সকলেই সমান, বরং অজ্ঞ, মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য ছে'লের জন্য যেমন পিতামাতার স্নেহ-মমতার টান বেশী, সেইরূপ পতিতপাবন ভগবান পতিতের জন্যই বেশী ব্যস্ত। বিশেষতঃ **সরলবিশ্বাসী নিরভিমানই** ভগবা[illegible] অধিকপ্রিয় বলিয়া যুগে যুগে তিনি সরল ও নিরভিমান নি[illegible] লইয়াই লীলা করিয়া থাকেন। এইজন্য রামের গুহক চণ্ডাল, কৃষ্ণের গোয়ালা, মহম্মদের দীনহীন অয়স্করণী, যীশুর জে'লে ভক্ত ও গৌরের যবন পর্য্যন্ত লীলার সহচর ছিলেন! জ্ঞানাভিমানিগণ

তাঁহাকে চিরদিনই ধরিতে ও বুঝিতে পারেন না, বরং যীশু-খ্রীষ্টের ক্রূশে বিদ্ধের ন্যায় বধ করিতেই বদ্ধপরিকর হন! তাই বলিতে চাই,—

ভগবান ও ভগবৎ-বিগ্রহ সকলেরই উপাস্য হইলেও সরল-বিশ্বাসী নিম্নস্তরেরই বিশেষ ভক্তির জিনিষ! তিনি তাঁহাদেরই সরলতামাখা আত্মার আত্মীয়রূপে হৃদয়ে প্রতিভাত হন বলিয়া তাঁহারাই চিরদিন সমধিক নিকটবর্ত্তী ও অভিমানিগণ অপেক্ষা অর্চ্চনার প্রকৃত অধিকারী। অতএব বিগ্রহ-মন্দির অধমতারণ ও পতিতপাবনের অধম-পতিতগণেরই যে সর্ব্বাপেক্ষা দাবীর স্থান তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব ও ভগবৎ সাধনার সমধিক যোগ্য এবং নিম্নবর্ণকে হীন, অস্পৃশ্য ও সাধনার অযোগ্য মনে করেন, সেই ভ্রাতৃ-বৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এই ভাব-বৈষম্যের মূলে কি শুধু আত্মাভিমানই কারণস্বরূপ বর্ত্তমান নয়? ভ্রাতঃ! অভিমানবশতঃ আপনি যাহাকে হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করেন, সে যে আত্মিক বিকাশে আপনার চেয়ে উন্নত ও ভগবানের অধিক নিকটবর্ত্তী নয়, তাহা কি আপনি হলপ করিয়া [illegible] পারেন? অন্যদিকে আপনার অভিমান আছে বলিয়া [illegible]ার হেয় ব্যক্তি আপনা হইতে দূরে থাকিলেও তাহার পরমপিতার নিকট হইতে দূরে থাকিবে কেন? এবং সে তাহার প্রাণারামের নিকটে যাইয়া প্রাণের বেদনাই বা জানাইবে না কেন? ভগবানের আরাধনা করিতে মানুষের অধিকার নাই,

একথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? কোন্ যুগে কোন্ অবতার পুরুষ ও মহাপুরুষের মুখে এমন কথা ব্যক্ত হইয়াছে?

ভাই! তোমার অবজ্ঞাত ব্যক্তি যে ভগবানেরও অবজ্ঞাত ও অস্পৃশ্য একথা কি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত? তুমি তোমার অভিমানের পাহাড় আনিয়া ভগবান ও জীবের মধ্যে স্থাপন করিয়া অনন্ত ব্যবধানের সৃষ্টি কর কেন? যাহা পৃথিবীর কোন মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষই কল্পনা করিতে পারে না, যাহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা এখনও এক শ্রেণীর লোকের অন্ধ-গোঁড়ামী হ'তে পতিত ভারতের পতনের চরম নিদর্শন-স্বরূপ ব্যক্ত হইতেছে! হায় কি পরিতাপ! যে দেবমন্দিরে ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, বেঙ্গ, সাপ ও পোকা-মাকড়ের প্রবেশে অধিকার আছে, মল-মূত্র পচা-গলা গায় মাখিয়া মশা-মাছি ও কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যে বিগ্রহ-অঙ্গ সর্ব্বদা স্পর্শ করিতেছে, ভগবানের প্রিয় শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না! এ দুঃখ! এ মরম বেদনা!! প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, শুনিবার লোক নাই!

যাঁহারা দেবার্চ্চনায় ও দেবমন্দিরে নিম্নবর্ণের অনধিকার বলিয়া দর্প করেন, সেই অভিমানী ভ্রাতাভগিনীদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের উচ্চবর্ণের ভগবান, পশু, প্রভৃতির ভগবান ও নিম্নবর্ণের ভগবান কি এক না দুই? ভগবান যদি এক না হইয়া দুই হইতেন, যদি আপনাদের উচ্চবর্ণের ও পশু-পক্ষীর ভগবান হইতে নিম্নবর্ণের ভগবান

পৃথক হইতেন, যদি ব্রাহ্মণ-বাড়ীর কালীপূজায় ব্রাহ্মণী কালীর এবং নাপিত-বাড়ীর কালীপূজায় নাপ্‌তিনী কালীর আবির্ভাব হইত, তবে না হয়, নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের বিগ্রহের নিকট হইতে জড়সড় হইয়া দূরেই সরিয়া থাকিত। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার যখন সেরূপ নয়, প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে,—একই মায়ের ছোট বড় পাঁচটী সন্তান প্রত্যেকেই যেমন মাতার ষোল আনার অধিকারী, প্রত্যেকেই যেমন কাছে আসিয়া মাকে 'আমার মা' বলিয়া গলা জড়িয়া ধরে,—কেহই মনে করে না 'আমি মায়ের একপঞ্চমাংশের অধিকারী', সেইরূপ বিশ্বের যাবতীয় জীব একই ভগবানের সন্তান, ভগবানের উপর প্রত্যেকেরই ষোল আনা অধিকার; সেই বিশ্বপিতার বা বিশ্বমাতার উপরে কাহারই আংশিক দাবী দাওয়া নাই ও থাকিতে পারে না। অতএব প্রত্যেক জীবরূপী সন্তানই যে প্রাণের আবেগে ছুটিয়া আসিয়া আপনার পরমপিতার চরণে লুটিয়া পড়িবে, ইহাতে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে কি? এখানে কাহারও অধিকার বেশী এবং কাহারও অধিকার যখন কম থাকিতে পারে না, তখন কোন দাম্ভিক সন্তান যদি পিতার অন্যান্য [illegible]র তনয়দিগকে পিতৃ-পদে ছুটিয়া আসিতে বাধা দিয়া [illegible]র জন্মগত অধিকার হ'তে বঞ্চিত রাখিতে চান, তবে মানবতার দিক দিয়া সেই ব্যবহারকে অত্যাচার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? দুঃখের কথা কত বলিব?—

অধঃপতিত সমাজের স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ নেতাগণ অন্যান্য

হিন্দুকে ভগবান হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া সাধনার নামমাত্র যতটুকু অধিকার দিয়াছেন, সেটুকুও নিজেদের প্রতিনিধিত্বের মারফতে! তাঁহারা ভগবৎ উপাসনার ধর্ম্ম-ব্যবসাটীকে অনন্ত কালের জন্য এমনভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে কায়েমী করিয়া বসিয়া আছেন যে, কোন প্রকার আরাধনা করিতে হইলে চিরদিনই সকলকে তাঁহাদের মারফতে ঘণ্টা নাড়া ও চাল-কলা নিবেদনের ভিতর দিয়া ভগবানকে প্রাণের কথা জানাইতে হইবে; নতুবা ভগবান কাহারও পূজা গ্রহণ করিবেন না! হায়! উকীল মোক্তারের হাত ধরিয়া হাকিমের সম্মুখীন হওয়ার মত প্রতি-নিধির মারফতে ভগবৎ সাধনা!! এরূপ কৌশলময় চির পরাধীনতার ভিতর দিয়া ব্যবসার ইন্ধন যোগান ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় নহে কি ?

ছোট বেলা একটা কথা শুনিয়াছিলাম,—পাশ্চাত্যদেশের রোমান্ ক্যাথলিক্ নামক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা স্বর্গের চাবি হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতেন; তাঁহাদিগকে অর্থ দিলে তাঁহারা মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিতেন! কিছুদিন পরে দেখিতে ও বুঝিতে পারিলাম,—আমাদের প্রাচ্য দেশের ধর্ম্মব্যবসায়ীরা, শুধু স্বর্গের চাবি নয়, ভগবৎ [illegible] ও নিত্য-নৈমিত্তিক যাবতীয় ব্যাপারের চাবি পর্য্যন্ত হাতে [illegible] এমন ভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যবসার ফন্দি আঁটিয়া সকলের মাথায় পা দিয়া বসিয়া আছেন যে, ইঁহাদের পড়া-ফুল না হইলে,

ক ধর্ম্ম কার্য্য, কি সামাজিক কার্য্য কিছুই হওয়ার উপায় নাই! ...াবার অনেক সময় বিগ্রহের সহিত পুরোহিতের দেখা ...র্য্যন্তও হয় না, শুধু পড়া-ফুলেই পূজা হয়!! মালো ও ...ধাপা প্রভৃতি যাঁহাদের পুরোহিত সংখ্যা খুব কম, তাঁহারা ...ক্ষ্মীপূজা প্রভৃতির পূর্ব্বেই পুরোহিতের বাড়ীতে গিয়া দক্ষিণার ...য়সা দিয়া পড়া-ফুল বা পড়া-চাল লইয়া আসেন, এবং পূজার ...ময় সমস্ত আয়োজন করতঃ ঐ পড়া-ফুল বা চা'ল ছিটাইয়া ...দিয়া পূজা শেষ মনে করেন!! বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও ...র্ম্মের নামে এমন পৈশাচিক অভিনয় চলিতেছে! সমাজ হইতে অবিলম্বে কি ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত নহে?

শুধু এই পর্য্যন্তই নয়, অন্যদিকে ঐ ধর্ম্ম-ব্যবসাটী কায়েমী করার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তারা হিন্দুসমাজের মাথায় চিরকাল পাদপদ্ম স্থাপিত রাখার জন্য এমন কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছেন যে তাহা স্মরণ করিতেও হৃদ্-কম্প উপস্থিত হয়! অভিমানিগণ আত্ম-প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য—জীব হইয়া ভগবানের অভিমান পরীক্ষার অছিলায় পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে ৭০ ...ধ্যায়ে সে লোমহর্ষণ পাপকাহিনীটী নিতান্ত ধৃষ্টতার সহিত নি...খিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন!—

...গুমুনি বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া ভগবানের বুকে পদাঘাত করিলেন! ভগবান লাথি খাইয়া অমনি শশব্যস্তে ভৃগুর পদে ব্যথা লাগিয়াছে কিনা তজ্জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন!! উহাই হইল জীবের মাথায় পা দিয়া পূজা পাইবার জন্য নেতাদের

অকাট্য নজির-সম্বলিত দলিল ! তাঁহারা ঐ অদ্ভুত শাস্ত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আজিও ভগবানের বুকে ঐ ভৃগুর পদাঘাতের কাহিনীটী ভাগবত-পাঠ উপলক্ষে বা যে কোন প্রসঙ্গে সদর্পে ঘোষণা করিয়া থাকেন ! যাঁহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য অহঙ্কারের সহিত ঐ পাপকথা উচ্চারণ ও স্মরণ করিতে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত নন, বরং গৌরবান্বিত ! ঐরূপ পাপ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে যাঁহাদের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হয় না ! এমন ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিকগণ ভগবানের বুক ও হিন্দুজাতির মাথা ছুঁইয়া কোন্ স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ি রচনা করিতেছেন ! বলিতে পারি না।

যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমরা উদার নৈতিক ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার-সাফল্য দেখিয়া ইহা নিশ্চয় আশা করিতে পারি যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণের চেষ্টায় পশ্চিমের চাবি যেমন খসিয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বের কায়েমী করা চাবিগুলিও ঠিক তেমনই অগৌণে খসিয়া পড়িবে। অতঃপর প্রত্যেক মানুষ তাঁহার পরমপিতার চরণে প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আপনার পুণ্যে আপনার পায় হাটিয়াই স্বর্গে যাইবে ও ভগবানকে লাভ করিবে।

ভাই সমাজপতি ! তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই, তুমি যদি কোন বিষয়ে বাস্তবিক সুযোগ্যই হ'য়ে থাক, তবে [illegible] বিষয়ে অন্য অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া লইতে পার। তুমি [illegible] হইলে অন্য অজ্ঞকে জ্ঞান দিতে পার। তুমি শক্তিমান্ হইলে আতুরকে ধরিয়া তুলিতে পার। নতুবা তুমি নিজে জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া অন্যকে বলিতে পার না যে,—ইহাতেই তোমার জ্ঞানলাভ

হইল! তোমার শক্তিতে তুমি চলিয়া ফিরিয়া কোন শয্যাশায়ীকে একথা বলিতে পার না,—ইহাতেই তোমার হাটা ও চলাফেরা হইল! তুমি নিজে জলপান করিয়া অন্য পিপাসার্ত্তকে বলিতে পার না,—ইহাতেই তোমার পিপাসার শান্তি হইল! তুমি আসিয়া ভগবৎ-বিগ্রহের নিকট বসিয়া মন্ত্র আওরাইয়া ও ঘণ্টা নাড়িয়া একথা বলিতে পার না,—ইহাতেই তোমার ভগবানের উপাসনা ও পূজা হইয়া গেল!! উহাতে বাস্তবিক অন্যের ভগবৎ-অর্চ্চনা হ'ক বা না হ'ক তোমার জীবিকার যে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইল, একথা অবিসম্বাদী সত্য।

ভাই ধর্ম্মযাজক! তুমি যদি বাস্তবিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাক, যদি তুমি অন্যকে সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যোগ্য হইয়া থাক, তবে তোমার যজমানের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হও। তাহার সাধন-ভজনের পদ্ধতি দেখাইয়া ও শিখাইয়া তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে দিয়া তাহার প্রেম-ভক্তির অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি তাহার ভগবানের চরণে অর্পণ করাও, সে কৃতার্থ হ'ক তুমি তোমার উপযুক্ত কর্ত্তব্যের জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ কর। পক্ষান্তরে প্রকৃত উপকারের ভিতর দিয়া [illegible]ও ব্যবসা থাক এবং মানুষ সব ক্রমে মনুষত্বের উচ্চতম [illegible]নীত হ'ক।

ঐ দেখ সংস্কারকামী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণ-সমাজ আজ মানুষকে মনুষ্যত্ব দিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য কেমন আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! আজ এক মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ যেন সহস্র দেহ ধারণ

করিয়া ভারতময় তাঁহার সাম্য-মৈত্রীর অভয়মন্ত্রে মৃতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভাই রক্ষণশীলগণ ! তোমরা কি এই শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ঐ আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মণত্বের চক্ষু মেলিয়া চাহিবে না ? হিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মের অধিকার দিবে না ? ভগবানের সন্তানকে ভগবানের কাছে আসিতে দিবে না ?

হায় ! সনাতনী ভ্রাতাগণ ! শাস্ত্র-নির্দ্দেশে এবং উপাস্যের সাধনার মৌলিক তত্ত্বে লক্ষ্য করিলে কিছুতেই তোমাদের গোঁড়ামী থাকিতে পারে না। কেননা তন্ত্রের সাম্যনীতি চাহিয়া দেখিলে, তোমরা কালী-মন্দিরে কাহারও অনধিকার বলিতে পার কি ? পক্ষান্তরে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যে পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিকে ভূত-প্রেত প্রভৃতি ঘৃণিত আখ্যায় অভিহিত করিতেন, সেই ভূত-প্রেত যখন শিবের সর্ব্বপ্রধান প্রিয়-সহচর, তখন শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অর্চ্চনা করিতে কোন্ নিম্নবর্ণের অনধিকার আমরা তো তাহা খুজিয়া পাই না ? যদি ব্রাহ্মণগণকেই শিবের সহচররূপে দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও না হয়, সনাতনী ভ্রাতাগণ, শিব-মন্দিরে শুধু নিজেদেরই কায়েমীকরা অধিকারের ঘোষণা করিতে পারিতেন। কিন্তু ঘটনা যখন বিপরীত, তখন তাঁহারা সেই অনার্য্য-সেবিত দেবতার মন্দিরে একচেটিয়া অধিকার [illegible] করিতে যাইয়া হীন ও হাস্যাস্পদ হন কেন ? ঐরূপ ভগবান্ রামের সহচর ও সাধক যখন বানর ভল্লুক আখ্যাত অরণ্যচারী অনার্য্যজাতি ও গুহকচণ্ডাল প্রভৃতি, তখন রাম-বিগ্রহের

মন্দিরেই বা কোন্ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার থাকিতে পারে? ঐরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যখন দেখিতে পাই গোয়ালপাড়ায় ভাত খাইতে এবং গোচারণ-মাঠে রাখাল বালকের উচ্ছিষ্ট খাইতে, সে সময় কোন ব্রাহ্মণকেই যখন নন্দঘোষের বাড়ীতে পাচকের কাজ করিতে ও কৃষ্ণকে ভোগ রাঁধিয়া দিতে দেখিতে পাই না, তখন শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে ও পূজায় শুধু ব্রাহ্মণেরই বা অধিকার থাকিবে কেন? আবার সকল সনাতনী ব্রাহ্মণকেই যখন বেদ ও গীতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে শুনিতে পাই, এবং বেদ ও গীতার নির্দ্দেশানুসারে যখন সকলের হৃদয়ে একই ঈশ্বর অবস্থান করেন—অভ্রান্ত সত্য, তখন নারায়ণের মন্দিরেই বা নর-নারায়ণের অনধিকার কেন?

এদিকে বাস্তব জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—৺পুরীধাম, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী, বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, নবদ্বীপ, কামেখ্যা, ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থস্থানে সর্ব্বমন্দিরে সর্ব্ববর্ণের প্রবেশের অধিকার আছে; সব মন্দিরের সেবাইতই শুধু ভেট-গ্রহণে ব্যস্ত থাকেন, কেহই কাহারও জাতি-গোত্র জিজ্ঞাসা করেন না। এইজন্য আমরা সনাতনী গোঁড়া ভ্রাতাদিগকে বলিতে চা[illegible], বিগ্রহ-মন্দিরে সর্ব্বত্রই যখন সর্ব্ববর্ণের প্রবেশের অধিকার [illegible] আসিতেছে, এবং সর্ব্বত্রই যখন উহা ব্যবহারিকভাবে সমাজে মানিয়া লওয়া হইতেছে, তখন বিগ্রহ-মন্দিরে প্রবেশে নিম্নবর্ণের অধিকার নাই, এই মিথ্যা আত্ম-প্রতিষ্ঠার আবরণ দিতে যাইয়া আর তাঁহারা জগতের কাছে লঘু ও হাস্যাস্পদ হন কেন?

এপর্য্যন্ত আমরা শুধু নিম্নবর্ণ নিম্নবর্ণ করিয়াই চীৎকার করিলাম, কিন্তু হিন্দুজাতির ভিতরে শুধু নিম্নবর্ণই যে অনধিকারী তাহাও নহে, অনেকস্থলেই ব্রাহ্মণেতর উচ্চবর্ণও অস্পৃশ্য। উচ্চবর্ণের ভক্তিমান শিক্ষিত ব্যক্তিকেও সামাজিক অনেক কাজে অস্পৃশ্যবৎ দূরে রাখা হইয়া থাকে। ইঁহাদের কেহ যদি দেবতাকে স্পর্শ করেন, তবে তাঁহার স্পর্শেও দেবতা অপবিত্র হন! তখন ঐ অপবিত্র দেবতাকে সুপবিত্র ব্রাহ্মণগণ গোময় ও গোমূত্র প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন! এই গোঁড়ামীপূর্ণ দেবতার শুদ্ধিকার্য্যে ভগবৎ-বিগ্রহ যে গোময়-গোমূত্র হইতেও হীন ও অপবিত্র প্রতিপন্ন হন, ইহা কর্ত্তাদের সূক্ষ্মবুদ্ধির গোচরীভূত হয় না!

অন্যদিকে ঐ দেবতার শুদ্ধি-ব্যাপার যদি নিম্নবর্ণ হ'তেও নিম্নতম কোন ব্রাহ্মণাখ্যাধারী ম্লেচ্ছাচারী ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, তবে তাহাতেও দেবতার পবিত্রতা বিধানে বিলম্ব হয় না! অমনি সে অপবিত্র বিগ্রহে পবিত্র ভগবান আসিয়া হাজির হন! হায়! দেবার্চ্চনার আবরণে এইরূপ জাত্যাভিমান ও গোঁড়ামীর পূজা হিন্দুসমাজ আর কতকাল বেকুবের মত মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইবে, ভাবিতে পারি না।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পর হইতে সমাজের প্রতি ঐ নির্ম্মম [illegible] ঘাত পড়াতেই যুগধর্ম্মের ঋষিগণ সমাজ-সংস্কারে ব্রতী [illegible] সনাতনধর্ম্ম রক্ষার আত্ম-নিয়োগ করাতে, আমরা আশা করি, এই নবযুগের কাণ্ডারী-গণের হাত ধরিয়া

হিন্দুসমাজ তাঁহার যাবতীয় ন্যায্য অধিকারে অধিকারী হইবেন, এবং সকলে সমান অধিকারে মন্দির-প্রবেশ করতঃ ভগবৎ আরাধনায় জীবন ধন্য করিয়া লইবেন।

আজ বিংশ-শতাব্দীতেও যে সব রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ—শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাপুরুষের বাণী পর্য্যন্ত মানেন না, এবং সংস্কারকামীদের উন্নয়ন-সাধনার বিরুদ্ধে কূটনীতির প্রচারে বদ্ধপরিকর হন; যাঁহারা অভিমান ও সঙ্কীর্ণতার মোহে শুধু আপনাদিগকেই মানুষ মনে করেন, আর সকলকে ভাবেন—অনন্ত কালের পূজা যোগাই-বার যন্ত্র,—অথচ হীন ও অস্পৃশ্য! তাঁহাদের অযৌক্তিক নীচ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না; তবে বরাহ-পুরাণে স্বয়ং শিব ইঁহাদের জন্মকুষ্ঠিতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাহাই স্মরণ করিতে বলি। শিব বলিয়াছেন,—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্।

রাক্ষসগণ কলিযুগে ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া বেদজ্ঞ সজ্জন সমাজকে প্রতিকার্য্যে বাধাবিঘ্ন প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা রক্ষণশীল নেতাদিগকে অনুরোধ কর্ি অতঃপর কেহ বরাহ-পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া [illegible]বতায় প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিবেন।

অস্পৃশ্যতা কোথায়?

যাঁহারা অস্পৃশ্যতা চিরস্থায়ী করিবার জন্য শাস্ত্রের ও গোঁড়ামীর জটিল কূটজাল বিস্তার করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা

করি, মৌখিক গোঁড়ামী ভিন্ন কার্য্যতঃ বাস্তবিক অস্পৃশ্যতাটা কোথায় ? আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভণ্ডামি ভিন্ন কোথাও যে বাস্তবিক অস্পৃশ্যতা নাই, নিম্নে ইহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে।

১। প্রথমতঃ উচ্চবর্ণের প্রত্যেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ডোম, বাগ্‌দি ও চামার প্রভৃতি নিম্নবর্ণের ধাত্রীরূপিণী মাতাদিগের হাতে আসিয়াই আত্মসমর্পণ করেন। যখন মাতা প্রসব যন্ত্রণায় মৃতবৎ অচেতন থাকেন, সন্তানের উপর লক্ষ্য করিবার উপায় পর্য্যন্ত থাকে না, তখন ঐ অস্পৃশ্যা মাতাদের চেষ্টায় ও যত্নে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করতঃ তাঁহাদেরই হাতে দুগ্ধাদি প্রাথমিক খাদ্য খাইয়া প্রত্যেককে জীবিত থাকিতে হয়। প্রসূতি পর্য্যন্ত ইহাদের স্পৃশ্য খাদ্য খাইয়া ইহাদের সাহচর্য্যে পুনর্জ্জীবন লাভ করেন, তখন অস্পৃশ্যতার বিচার মোটেই থাকে না, বিপদ কাটিয়া গেলে, জাতি বিচার আরম্ভ হয়! কেহ কি বলিতে পারেন যে, পৃথিবীতে আসিয়া প্রথমেই নিম্নবর্ণের স্পর্শে ও স্পৃশ্য খাদ্যে তাঁহার জীবন রক্ষা হয় নাই ? জন্ম সময়েই যাঁহারা মাতৃস্নেহে বুকে ধরিয়া স্তন্যাদি পান করাইয়া জীবন রক্ষা করেন, তাঁহারা অস্পৃশ্য !! ইহা কি ভীষণ অকৃতজ্ঞতা ও নিমক-হারামী নয় ?

২। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণের অন্নপ্রাশন আরম্ভ হয় কাহার অন্নে ? কাহার অন্নে উচ্চবর্ণ চিরকাল জীবন

ধারণ করেন? নিম্নবর্ণের হাতের * চাল, ডাল, তরকারী, ঘি, দুধ, গুর, চিনি, মুড়ি, পাওরুটি, বিস্কুট, সোডা, লিমনেড ও বরফ প্রভৃতি কি উচ্চবর্ণের জীবন সম্বল নিত্য খাদ্য নয়? নিম্নবর্ণের হাতের দলিত, মথিত, পিষ্ট ও পাককরা জিনিষ সমূহই কি উচ্চবর্ণের দেহ-গঠনের উপকরণ নয়? ইহাদের অন্নে সকলের উদর পূর্ণ, ইহাদের রক্তকণা চুষিয়া সকলের শরীরে রক্ত, ইহাদের শক্তিতে প্রতি দেহ ও জাতি শক্তিমান, ইহাদের ধনে পৃথিবী ধনী, ইহাদের অস্থি-পঞ্জর দ্বারা ধনীর অট্টালিকা ও সম্রাটের সিংহাসন গঠিত, ইহাদের স্পর্শ যেখানে নাই, সেখানে [illegible]বান্ সৃষ্টি ও স্থিতি বাদ দিয়া শুধু প্রলয় মূর্ত্তিতে দেখা [illegible] থাকেন। অতএব ইহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত সত্য যে,—সমাজ সেবক, [illegible]ণেই ভগবানের সৃষ্টি ও স্থিতি-রক্ষার হেতুভূত সত্ত্বগুণের মূর্ত্ত[illegible]বিকাশ। অথচ অভিমানী উচ্চবর্ণ এই আত্মশক্তির মূল ভিত্তিস্বরূপ নিম্নবর্ণকে সমাজ শরীর হইতে পৃথক করিয়া যে নিজেরা হাত-পা ও শক্তি-হীন অবস্থায় পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছেন, একবারও তাহা ভাবিয়া প্রতিকারে প্রবৃত্ত হন না!

---

* একজন নিম্নবর্ণের আদালতের পিয়ন এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে গিয়া [illegible]য়ই কার্য্যপ্রয়োজনে উপস্থিত হয়। বাড়ীর কর্ত্তা বলিলেন, [illegible]ত আমাদের হাতে ভাত খাও না, খাওয়ার কি হবে? পিয়ন বলিল, আপনারা সিদ্ধ চাল খান কি আতপ খান? কর্ত্তা বলিলেন—সিদ্ধ। পিয়ন হাসিয়া উত্তর করিল, তবে আমার খাইতে আপত্তি নাই, উহা প্রথমে আমাদের হাতেই সিদ্ধ করা আছে।

অন্যদিকে নিম্নবর্ণকে এতকাল অনাদরে ও অযত্নে হীনাবস্থায় ফেলিয়া রাখাতে তাঁহারা যেরূপ ঘৃণিত আচার ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহার ফলে তাঁহাদের অনিষ্ঠা ও অনাচারের হাত হইতে জঘন্যভাবে প্রস্তুত খাদ্যাদির ভিতর দিয়া উচ্চবর্ণকে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্ত্তে এটো ঝুটা খাইতে হইতেছে। শুধু তাঁহাদের এটো ঝুটাই খাইতে হয় না, তাঁহারা ছেলেপুলে লইয়া যেরূপ অনাচার ও কুশিক্ষার ভিতর দিয়া নোংড়া পাত্রে অপরিষ্কারভাবে চাল, ডাল, চিড়া, মুড়ি ও অন্যান্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করে, গাভী দোহন করে, গুড় জ্বাল দেয়, তাহাতে তাঁহাদের ছেলেপুলের মল-মূত্রও যে হোমিওপ্যাথিক ডোজে সর্ব্বদা উচ্চবর্ণের উদরস্থ হইতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। হায়! যে গাভীর দুধ খাইতে হয়, তাহাকে যে ঠাকুর দেবতার মত যত্ন করিয়া পোষা দরকার এ বুদ্ধিটাও আমাদের নাই! যেমন নাই, তেমন রুগ্না গাভীর বিষাক্ত দুধ খাই, এজন্য দায়ী কে, দোষ কার? যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ভোগ!! এইরূপ ফলভোগ করা সত্ত্বেও মৌখিক গোঁড়ামী করা হয় যে, আমরা নিম্নবর্ণের ছোঁয়া জিনিষ খাই না! উচ্চবর্ণের এইরূপ অভিমানের কোনই কারণ নাই, একথা বরং নিম্নবর্ণই বলিতে পারে যে, আমরা উচ্চবর্ণের হাতের কোন জিনিষ খাওয়া দূরে থাক স্পর্শও করি না।

৩। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে যে জল অচল করিয়া রাখিয়াছেন, সে জল কি সেই নিম্নবর্ণেরই শ্রম-লব্ধ প্রসাদস্বরূপ উচ্চবর্ণ

প্রাপ্ত হইতেছেন না ? পুষ্করণী, কূপ ও ইন্দারা যাহা কিছু খনন করা হ'ক্, তাহা কোন্ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে ? নিম্নবর্ণই খনন শেষ করিয়া জল তুলিয়া দেয়, তৎপরে তাহা তাহাদের ছুইবার অধিকার থাকে না! এখনই যদি কূপে জল না থাকে, তবে নিম্নবর্ণের যে কোন হিন্দু বা মুসলমানকে পর্য্যন্ত কূপে নামাইয়া দিয়া পঙ্কোদ্ধার করা হইবে। তাহরা জল তুলিবার ব্যাপারে কটিদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া মল ও মূত্রমার্গের মালিন্য ধুইয়া রাখিয়া আসিলে পরে ঐ মহাপ্রসাদ পান করিয়া উচ্চবর্ণ প্রাণ বাঁচাইয়া থাকেন! এর পরে আবার আবশ্যক না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জল স্পর্শ করা দূরে থাকুক, উপর হ'তে কূপের পাটখানাও ছুইতে দেওয়া হয় না! হায়! শিয়াল-কুকুরে দিনরাত যে কূয়া ছুইতেছে, তাহা মানুষকে ছুইতে দেওয়া হয় না! এমন অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা যে জাতির পবিত্রতার গোঁড়ামী! মানুষকে এমন ভাবে শিয়াল কুকুর হ'তে, যাঁরা ঘৃণা করেন! তাঁহাদের হীনতা, নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা-মূলক শ্রেষ্ঠতার অভিমান বাস্তবিকই অমার্জ্জনীয়।

৪। অন্ন-জল প্রভৃতি খাদ্যাদির স্পৃশ্যতার কথা বাদ [illegible]য়া দেবার্চ্চনার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও দেখা যাইবে— [illegible]ণ-সমাজ যে দেবমন্দিরে নিম্নবর্ণের প্রবেশে আপত্তি করেন, সেই দেব'দেবীর মূর্ত্তি গড়িবার সময় নিম্নবর্ণের যে কোন ব্যক্তি মাটি আনিয়া উহা পা দিয়া উত্তমরূপে দলিত ও মথিত করিয়া পিষিয়া দিলে তবে তদ্দ্বারা কারিকর দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া

থাকেন ! দেবতার অঙ্গরাগ, সাজসজ্জা ও পূজার মন্দিরে নিয়া হাজির করা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়েই নিম্ন বর্ণের অধিকার ! কিন্তু কষ্টকর কার্য্যগুলি শেষ হইয়া গেলে পূজার সময় কর্ত্তারা একচেটিয়া দখল করিয়া বসেন, তখন আর মন্দির-প্রবেশে কাহারও অধিকার থাকেনা ! তখন আর সকলেই অস্পৃশ্য, সকলেই অপবিত্র, পবিত্র শুধু অপগণ্ড বালক-বালিকা সমেত আপনারা স্ত্রী-পুরুষ সব ! আপনাদের পবিত্রতার স্পর্শে তখন দেববি-গ্রহের ভিতরস্থ নিম্নবর্ণের পায়ের ধূলা, ময়লা এবং কাদা পর্য্যন্তও দেবত্বের গৌরব ও সৌরভ লইয়া ফুটিয়া উঠে !! এখন ভগবৎ-বিগ্রহ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও স্পর্শ সহ্য করিতে পারেন না !!

এপর্য্যন্ত যাহা কিছু আলোচিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উচ্চবর্ণ যেখানেই অসমর্থ, তথায়ই নিম্নবর্ণের অধিকার, আর যেখানে সমর্থ তথায় নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্যতার ব্যবধানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ মাপ করা হইয়া থাকে ! নতুবা প্রসবের সময় জীবন রক্ষা করার বেলায় নিম্নবর্ণ, খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার যোগাইয়া অবিরত রক্ষা করার বেলায়ও নিম্নবর্ণ, উপাস্য দে[illegible] মূর্ত্তিটি গড়িবার বেলায়ও নিম্নবর্ণ, পূজার জন্য পদ্মফু[illegible] বেলপাতা প্রভৃতি কষ্টকর কাজেও নিম্নবর্ণ !! পূজার চাল, কলা, দুধ, ঘি ও গুড়-চিনি সবই যোগায় নিম্নবর্ণ ! গঙ্গাজল আনা কষ্টকর, সুতরাং তাহাও যোগায় নিম্নবর্ণ ! নিম্নবর্ণের

ঐ জল পূজায় দিতে, এবং উহারই এক কোঁটা মৃত্যুসময়ে মুখে দিয়া স্বর্গে যাইতে বাধা হয় না! বাধা হয়,—কূপ-পুষ্করণীর জলে ও বাগানের সহজ-সাধ্য ফুলে! ইহা ভিন্ন হোটেলের ভাতে, দোকানের-চা-বিস্কুটে, পাওরুটীতে, ডিমে-মাংসে, সোডা-লিমনেডে এবং বরফে কিছুতেই বাধা হয় না! এসব ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই উচ্চবর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের খাদ্যের স্পৃশ্যতা বর্ত্তমান! সর্ব্বত্রই যখন অবিচারে নিম্নবর্ণের অন্ন-জল খাইয়া উচ্চবর্ণ জীবন ধারণ করেন, তখন আমার গোঁড়া ভাইদিগকে বলিতে চাই, মূলে অস্পৃশ্যতা কোথায়? অস্পৃশ্যতা শুধু একটা মৌখিক ভণ্ডামী মাত্র নহে কি?

৫। ধর্ম্মক্ষেত্রের অভেদ-নীতি সকলেই জানেন। ৺পুরীধামে খাদ্যে জাতিভেদ নাই। ইহা ভিন্ন প্রভু জগদ্বন্ধুর আঙ্গিনায়, রামকৃষ্ণ-মিসনে এবং ঠাকুর দয়ানন্দ, অবধূত জ্ঞানানন্দ ও ঠাকুর অনুকূল প্রভৃতি যাবতীয় মহাপুরুষের আশ্রমে সর্ব্বজাতি একসঙ্গে বসিয়া—যে কোন ব্যক্তির হাতে খাইয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস,—এমন কোন উচ্চবর্ণ নাই, যিনি অন্ততঃ মহাপুরুষের ও পুরীর সাম্য-নীতির ভিতর দিয়া নিম্নবর্ণের স্পৃশ্য [illegible]খান নাই। বাজারের পিঠা (কেক) তো মুসলমান বা [illegible]নের হাতের হইলেও মহাপ্রসাদ!

৬। অজ্ঞাত-কুলশীল ঝি-চাকর রাখার বেলায় অস্পৃশ্যতার বিচার কোথায় থাকে? তাহাদের জাতি-গোত্র কে অনুসন্ধান করে? ঠেকা কাজের বেলায় যদি গোজামিল দেওয়া হয়, এসব

ব্যাপারে যদি যে কোন ব্যক্তির হাতে খাইয়া কাহারও জাতি না যায়, তবে শুধু জীবন-রক্ষক সমাজ-সেবক পরিচিত ভ্রাতাদের সহিত প্রাণের স্পৃশ্যতা স্থাপন করিতে মৌখিক ও লৌকিক গোঁড়ামীর কুসংস্কারটা বাদ দেওয়া কি উচিত নয়? যে জাতি-তত্ত্বের মূলে বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই, যাহা কোন একটা উপাদানভূত পদার্থ নয়, যাহার মূল একটা সংস্কার মাত্র, সেই কাল্পনিক অপদার্থ সংস্কারটাকে ধরিয়া মহান্ সত্য ভগবৎ-শক্তির আধার মানব-সঙ্ঘকে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য বোধ করার মত অন্যায় ও মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। 'যাহাদের পরস্পরের মিলনে সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহারা এক জাতি, ইহা হইতেছে, ভগবানের সৃষ্ট জাতি-তত্ত্বের মূলরহস্য; যেমন সমস্ত গো লইয়া গো-জাতি, যাবতীয় অশ্ব লইয়া অশ্ব-জাতি, **সমস্ত মানুষ লইয়া একই মানবজাতি**। ভগবদ্দত্ত এই স্বাভাবিক জাতি-বিভাগের বাহিরে কাল্পনিক জাতি শুধু দেশ ও কর্ম্মভেদে সঙ্ঘবদ্ধগত বিভাগ মাত্র। সুতরাং ইহার ভিতরে অস্পৃশ্যতার কি আছে বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে যে জাতি বিচারের ও অস্পৃশ্যতার গোঁড়ামী ছিল না, এসম্বন্ধে মহর্ষি-মনু স্বীয় সংহিতায় ৪।২৫৩ অধ্যায় বলিতেছেন,—

"আর্দ্ধিক কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥"

অর্থাৎ কৃষক, কুলমিত্র, গোপালক, চাকর, নাপিত ও শূদ্র ইহাদের

অন্ন ভোজন করা যায়। এর পরে মনুমহারাজ স্বীয় সংহিতায় ৪।২।৪৭ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

"এধোদকং ফলমূলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নিয়ান্মধ্বভয়দক্ষিণাম্॥"

অর্থাৎ কাষ্ঠ, জল, ফল, মূল, অন্ন, মধু, অভয় ও দক্ষিণা আসিয়া উপস্থিত হইলে সর্ব্বস্থান হইতেই তাহা গ্রহণ করা যায়। ইহা ভিন্ন আপস্তম্বঋষি প্রশ্নোত্তর ভাবে স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে লিখিতেছেন,— "কঅশ্যান্ন?" অর্থাৎ কাহার অন্ন খাইবে? ইহার উত্তরে "ইপ্সেদিতি কম্বঃ।" কম্বঋষি (১।৬।১৯) সূত্রে উত্তর করিলেন,—"যে খাওয়াইতে চাহে।" অতঃপর ঐ (৫।১।৬।১৯) অধ্যায়ে আপস্তম্বের প্রশ্নে—"যে কশ্চিদ্ দদ্যাদিতি বার্যায়ণিঃ।" বার্যায়ণি ঋষি উত্তর করিলেন,—"যে কেহ দিলে সেই অন্নই খাইবে।" এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করিতেছে,—খাদ্য সম্বন্ধে কোন জাতি বিচার বা অস্পৃশ্যতা ছিল না।

বৌদ্ধ যুগের পরে শঙ্করাচার্য্য দেবের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-স্থাপন হইতে যে অস্পৃশ্যতা ও ভেদনীতি সমাজে সুদৃঢ় হইয়াছে, ইহা শঙ্করাচার্য্যও তো মানিতেন না। শঙ্করাচার্য্যদেব জাতিভেদ মানিলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দু করিয়া ব্রাহ্মণাদি জাতিতে [illegible]ত করিলেন কেমন করিয়া? এই ঐতিহাসিক সত্য কে [illegible]কার করিবেন? ইহা ভিন্ন তিনি বহু জেলে-সম্প্রদায়ের গলায় উপবীত দিয়া দলকে দল ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়াছিলেন! * অতএব ভেদনীতি ও অস্পৃশ্যতা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে মূলে কোথায়?

* ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থে ৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের অস্পৃশ্যতার গৌড়ামী ভিত্তি শূন্য।

বৌদ্ধযুগের পরে যখন আদিশূর যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বঙ্গদেশে ধর্ম্মকর্ম্ম বর্জ্জিত কতিপয় পতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারাও খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্ম্মের ফেরৎ—শঙ্করাচার্য্য দেবের হাতগড়ান। যাহা হউক বাঙ্গলায়' উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে চেষ্টা করিয়া প্রথমতঃ বিফল-মনোরথ হন। কারণ—'বাঙ্গলায় হিন্দু নাই, তথায় গেলে পতিত হইতে হইবে', এই জন্য কান্যকুব্জ-রাজ বীরসিংহ আদি-শূরের প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ পাঠাইতে অসম্মত হন। অতঃপর আদিশূর স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন-মানসে, ধর্ম্ম-ভীরু কান্যকুব্জরাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ আনিবার এক অভিনব ফন্দি আটিয়া সাতশত অনার্য্যকে উপবীত দিয়া যুদ্ধবেশে গো-বাহনে কান্য-কুব্জে পাঠাইলেন! এসম্বন্ধে ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকা বলেন,—

"ততঃ সপ্তশতাঃ গত্বা অস্পৃশ্যা হীন সম্ভবাঃ।
বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারূঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ।"

অনার্য্যগণ বিপ্রবেশে গিয়া ব্রাহ্মণের দাবীর মারফতে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, বীরসিংহ একসঙ্গে ব্রহ্মহত্যা ও গো-হত্যার ভয়ে যুদ্ধে বিরত হইয়া সাতশত যুদ্ধার্থী বীরকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ আখ্যায় অভিনন্দিত করিয়া প্রার্থিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ দিয়া [illegible] করিলেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ রণজয় করিয়া বাঙ্গলায় ফি[illegible] আসিলেন, যজ্ঞ সম্পন্ন হইল!

সম্বন্ধনির্ণয়গ্রন্থ ২১২ পৃষ্ঠায় সাক্ষ্য দিতেছে,—ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় আসিয়া পতিত হইয়াছেন বলিয়া কান্যকুব্জরাজ ফেরৎ-গ্রহণ না করায় ইঁহারা সপ্তশতী প্রভৃতির কন্যা বিবাহ করিয়া বাঙ্গলাতেই রহিয়া গেলেন! অতএব—

বৌদ্ধ-প্লাবনের পরে বাঙ্গলার মোট ব্রাহ্মণ হইলেন,—পরাশর ও অণিকনামক পতিতগণ, সপ্তশতীগণ এবং যজ্ঞার্থে প্রেরিত পঞ্চজন। সুতরাং এই ব্রাহ্মণগণই যে বঙ্গালার বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের আদি-পুরুষ ইহা ঐতিহাসিক সত্য অতএব মূল বিচার করিলে সকলের ভিতরেই যখন সপ্তশতী ও অণিক প্রভৃতির সংস্রব স্বীকার করিতে হয়, তখন অস্পৃশ্যতার ও বর্ণ-শ্রেষ্ঠতার গোঁড়ামী পরিত্যাগ করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান কায়স্থগণের মৌলিকতত্ত্বও ব্রাহ্মণগণেরই অনুরূপ। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ আগমন করেন, কান্যকুব্জরাজ ইঁহাদিগকেও পতিত বলিয়া ফিরিয়া গ্রহণ না করাতে, ইঁহারাও বাঙ্গলার কায়স্থগণের সহিতই মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদেরই কন্যা বিবাহ করিয়া এখানে বাস করিতে বাধ্য হন। তাৎকালিক বঙ্গীয় কায়স্থ-গণের মধ্যে অনেকেই সহস্র বৎসরের বৌদ্ধ-প্লাবনে ক্রিয়াকাণ্ড-শ[illegible]তিত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ফেরৎও অনেকে পুনরায় হিন্দু হইয়া যে কায়স্থ-সমাজে আসিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। আবার গারো, খাসিয়া, শক ও হূন প্রভৃতি নানা অনার্য্য-জাতিও যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ফাক

আসিয়া হিন্দুর চতুর্ব্বর্ণে আশ্রয় লইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি সর্ব্ববর্ণের ভিতরেই যে তাহাদের অল্পাধিক মিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগে যখন জাতিভেদ মোটেই ছিল না, এবং তৎপূর্ব্বেও যখন জাতি ভেদের গোঁড়ামী দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সময়ে সকলের পিতৃপুরুষই যখন সকলের সঙ্গে মিশিয়াছেন ও সকলের হাতে খাইয়াছেন, তখন তাঁহাদের বংশধর হইয়া আমাদের ছুঁৎমার্গের গোঁড়ামীর মূলে কি অস্তিত্ব আছে ? নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে,—আমাদের সকলের দেহেই সকলের রক্ত-সংশ্রব আছে, এবং 'সকলের পেটেই সকলের অন্ন গজগজ করিতেছে !' অতএব সকলেরই ভেদবুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার ভিত্তি-শূন্য।

কর্ম্মী সঙ্ঘের পবিত্র জীবন-ব্রত।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ও গৃহসামগ্রী এই চারি শ্রেণীর জিনিষ প্রয়োজন। উহাতেই জগৎটা রক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছে। ঐ আবশ্যকীয় চারিটী প্রয়োজন যাঁহাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়,—যাঁহারা আপনাদের ঐ কর্ম্মের ফল বিলাইয়া দিয়া জগৎটাকে খাওয়াইয়া পর[illegible] শান্তির মন্দিরে শোয়াইয়া রক্ষা করিতেছেন, যাঁহাদের স্বাবলম্বনের অমৃত-প্রবাহে জগৎ সঞ্জীবিত, যাঁহাদের সরলতা-মাখা ঢল ঢল ছল ছল ভাব-মাধুর্য্যে কর্ম্ম-জগৎ ও ধর্ম্ম-জগৎ অমৃ[illegible]মান, তাঁহারাই যে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মপথ অবলম্বন

করিয়া পবিত্র জীবনব্রতে ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। ঐ কর্ম্মপ্রবাহই জগজ্জীবের একমাত্র লক্ষ্য ও মুখ্য হওয়াতে উহার নির্ব্বাহের জন্যই যাবতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কল-কারখানার নিয়ন্ত্রন, এবং উহার গৌরবেই প্রত্যেক জাতি গৌরবান্বিত। সুতরাং মানব-স্থিতি রক্ষাকারক ঐ কর্ম্মীসঙ্ঘ সমূহই যে জগতে সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকীয় শ্রেষ্ঠ কর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ও পরকীয় মঙ্গল-বিধান করিতেছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। * যাঁহারা ঐ পবিত্র কর্ম্ম-পথকে ঘৃণা করতঃ ছল, বল, কল, কৌশল, ভণ্ডামি ও গুণ্ডামি অবলম্বন করিয়া পাশবিক স্বার্থসঙ্কীর্ণতায় বা দস্যুতায় অভিভূত, এবং যাঁহারা দাসত্ব বা চাকুরীকে সম্মানের কাজ মনে করিয়া উহার মোহ-মদিরায় বিমোহিত, তাঁহাদের সহিত জীবন-রক্ষক কর্ম্মীসঙ্ঘের তুলনা করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ ঐ মানব-স্থিতি রক্ষাকারীদিগকে ভ্রান্তিমূলক অস্পৃশ্যতার পাশ-মুক্ত করিয়া সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবেন, ইহা আশা করিতে পারি। অন্যথায় আমাদের অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ভগবান যে আরও ভীষণ ভাবে ভোগ করাইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ নিরন্ন কঙ্কাল ভারতবাসীকে [illegible] নানারূপ অগ্নিগর্ভ প্রলয়-মেঘ অবিরত বজ্র-নিক্ষেপণে [illegible]ষ্পেষণ করিতেছে, ইহা কি আমাদেরই 'মানুষ ঘৃণা করা'

* মানুষ মাত্রই কোন না কোন প্রকারে সমাজ সেবার কর্ম্মে নিরত। তন্মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশকারী মনীষী ঋষির দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা-বর্ণনায় উহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে? আমরাই কি আমাদের সঙ্কীর্ণতার অস্ত্রে স্বীয় অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ৮ কোটী মুসলমান ও ৬০ লক্ষ খৃষ্টাণের সৃষ্টি করতঃ আত্ম-হত্যার ব্যবস্থা করি নাই? আজ অভিমানের মোহে সমাজপতি তুমি নিজেও যে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বংসের পথে গিয়াছ, তোমাকে রক্ষা করে কে? ঐ বিচ্ছিন্নতার মূলীভূত আভিজাত্যের কুসংস্কার দূরীভূত করতঃ সমস্ত জাতিকে একতার সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তোমার আত্ম-রক্ষার পথ উন্মুক্ত করা কি কর্ত্তব্য নয়? এস ভাই! আজ আমরা মানুষকে মানুষের সম্মান দিয়া পূজা করিতে শিখি, যাহা আমাদের প্রাচীন ঋষিযুগে হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দু-সমাজের মূল-ভিত্তিস্বরূপ ছিল, যাহা আমাদের ধর্ম্মের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য ও গৌরবের স্থল রহিয়াছে।

শুচি-সঙ্ঘের পবিত্র জীবন ব্রত।

মানব-স্থিতি রক্ষা করিতে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মীসঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে—সমাজকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার জন্য শুচি-সঙ্ঘের প্রয়োজন। ঐ শুচি-সঙ্ঘ তোমার বাড়ীর মলমূত্র ও আবর্জ্জনা দূর করিয়া সর্ব্বদা পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যসুখের ব্যবস্থা করিতেছেন। আজ সমাজ হ'তে শুচি-সঙ্ঘের কাজ বাদ দিলে তোমাকে ঐ মল ক্লেদে ডুবিয়া পচিয়া গলিয়া মরিতে হইবে, সুখের বাসস্থান হইবে মূর্ত্তিমান নরক, স্বাস্থ্য-

সুখের পরিবর্ত্তে পাইবে, চিররোগ ও অকাল মৃত্যু! অতএব এই শুচি-সঙ্ঘের নিকট তুমি যেপরিমাণ ঋণী এরূপ ঋণী আর কাহারও নিকটে নও।

শুচি-সঙ্ঘ মল পরিষ্কার করেন বলিয়া অনেকে ইঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মল-পরিষ্কার করাটা ঘৃণিত কাজ নহে। মল পরিষ্কার করা যদি ঘৃণিত কাজ হইত, এবং সেজন্য যদি মানুষ অস্পৃশ্য ও ঘৃণার পাত্র হইত, তবে প্রত্যেক বাড়ীর মা-ভগ্নিগণ দিন রাত্রিই যে মল ঘাটিয়া থাকেন, এমন কি খাইতে শুইতে রান্না করিতে বসিয়াও যে তাঁহাদিগকে মল ঘাটিতে হয়, এজন্য কেহ কি ঘৃণা করিয়া তাহাদের হাতে খান না? বা অস্পৃশ্য মনে করেন?

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক মানুষই প্রতিদিন মল-ত্যাগের সময় দুই এক বার মল-মার্গ প্রক্ষালন করেন। সুতরাং কেহই এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে, তিনি প্রত্যহ নিজ হাতে মল পরিষ্কার করেন না। তবে নিজের মলে ও অন্যের মলে যদি কিছু সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের তারতম্য থাকিত, তবে সে অন্য কথা। নতুবা তুমি প্রত্যহ নিজ হাতে মল পরিষ্কার করিয়া ঘৃণ্য না হও, তোমার মা-ভগ্নী দিনরাত্র মল ঘাটিয়া যদি ঘৃণ্য না হন, তবে তোমারই স্বাস্থ্য-সুখের ও শান্তির ব্যবস্থার জন্য যাঁহারা শুচিতার কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে তোমার ঘৃণ্য মনে করার পরিবর্ত্তে কি শ্রদ্ধা করা উচিত

নয়? তাঁহারা কি তোমারই প্রতিনিধি স্বরূপে তোমারই করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন না?

পক্ষান্তরে ঘরে ঘরে মাতৃদেবীগণ দিনরাত্রই ছেলে-মেয়ের মল পরিষ্কার করেন, আর শুচিসঙ্ঘের সেবকগণ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট ২।৩ ঘণ্টাকাল শুচিতার কার্য্য করিয়া পরে সারা দিনরাত্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। এ অবস্থায় শুচি-সঙ্ঘের সহিত স্পৃশ্যতার কি বাধা থাকিতে পারে বুঝি না। কর্ত্তাদের যেরূপ শুচি-জ্ঞান দেখিতেছি, তাহাতে এর পরে তাঁহা[illegible] পরিবার-বর্গের মলমার্গ ধৌত করার জন্যও যে মেথরের ব্যবস্থা করিয়া বসিবেন, ইহা আশা করিতে পারি। যাহা হ'ক উপসংহারে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মাতৃ-ভূমিকে ও আব্‌হাওয়াকে দূষিত কর, এবং শুচি-সঙ্ঘ তাহা পরিষ্কার ও পবিত্র করেন; এস্থলে কার কাজ শ্রেষ্ঠ? যে দূষিত করে তার? না যে পবিত্র করে তার? যার কাজ শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং স্বাস্থ্য-সুখ ও জীবন-রক্ষক শুচি-সঙ্ঘ অশোধনীয় ঋণের কার্য্যের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ব্যভিচার নহে।

অনাচারীকে সদাচারী করা, অশিক্ষিতকে সুশিক্ষিত ক[illegible] অজ্ঞকে জ্ঞানী করা, এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বর্জ্জিতকে ধর্ম্ম-ক[illegible] ভিত্তিতে তুলিয়া লইয়া, ঐ উন্নয়নের ফলে আপনাদিগকে পবিত্র ও শক্তিশালী করাই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে নিকৃষ্টতা নাই, মহাপ্রাণতা আছে, অনাচার ও ব্যভিচার

নাই, অনাচার ও ব্যভিচারের মূলোচ্ছেদ আছে, কপটতা ও ভণ্ডামীর অবসান আছে, আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষা আছে।

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনে অখাদ্য খাইতে হয় না; অখাদ্য কুখাদ্য খাইতে হয় অস্পৃশ্যতা জিয়াইয়া রাখিয়া। কেননা উহাতে নিম্নবর্ণ কুশিক্ষার প্রভাবে ভ্রষ্টাচারী ও অনাচারী হইয়া সেই হলাহলে দেশ প্লাবিত করিয়া দিতেছে। এই হলাহল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে জাতীয় পবিত্রতা প্রয়োজন। জাতীয় পবিত্রতার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু নিজে ছুঁৎমার্গ লইয়া বসিয়া থাকিলে, সে অনাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। কেননা, দেশের সকলে ম্যালেরিয়ায় ভুগুক আমি শুধু নিরোগ থাকি, দেশের সকলে মূর্খ থাকুক আমার ছেলেটি শুধু জ্ঞানী হউক, সকলে দরিদ্র থাকুক, আমি শুধু ধনী হই, সকলে অপবিত্র ও অনাচারী থাকুক, শুধু একা আমি শুদ্ধাচারী হই, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উহাতে উল্টা ফল ফলে, সকলকেই ঐ সংক্রামকতায় আত্মাহুতি দিতে হয়। অতএব নিম্নবর্ণের উন্নয়ন, সদাচার ও পবিত্রতার ব্যবস্থা যেদিন হইবে, সেদিন উচ্চবর্ণ প্রকৃত সদাচারী হইতে পারিবেন; নতুবা শিষ্টাচার শুধু ছুঁৎমার্গের ভণ্ডামি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভ্রাতৃগণ! অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে বাস্তবিকই জাতীয় সদাচারের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অনিষ্ঠা বা ব্যভিচারের বিন্দু বিসর্গও নাই!

সুতরাং কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া মানুষের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করুন। ভাইসব ! পরম উদার হিন্দুধর্ম্মে অস্পৃশ্যতা নাই, আছে,—সর্ব্বত্রই স্পৃশ্যতা, আছে—বিশ্বজনীন উদার প্রেমের প্রাণভরা আলিঙ্গন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উদার ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্য নাই। ধর্ম্মের বাণী ও আদর্শ লইয়া আর আজ কেহ চলিতে রাজী নহেন। সমাজের ব্যবহারিক সঙ্কীর্ণ আচারের নামই হ'য়েছে এখন ধর্ম্ম ! অতএব অবিলম্বে ঐ অসামঞ্জস্যতা দূর করিয়া আমাদিগের সমাজকে মহান উদার ধর্ম্মের ভিত্তিতে মহাপ্রাণতা দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। যে দিন আমরা উদার ধর্ম্মের ভিত্তিতে উদার হিন্দুজাতির গঠন করিতে পারিব, সেদিন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অমৃত-ধারায় সমস্ত জগৎ ধন্য হইয়া যাইবে। জগতে থাকিবে,—মানবাত্মার বিকাশের একমাত্র পরম ও চরম স্বর্গীয়-সোপান—হিন্দুধর্ম্ম, এবং মানবজাতি লইয়া গঠিত বৈদিক-ঋষি-যুগের উদার হিন্দু-সমাজ। ভ্রাতৃগণ ! হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষত্ব হ'তেছে আধ্যাত্মিকতায়। মানুষকে ঐ বিশেষত্বে বা মনুষ্যত্বের পূর্ণতার দিকে টানিয়া তোলাই হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির বিশেষত্ব। আসুন ! আমরা আমাদের সাধনার সিদ্ধি দ্বারা জগতের ঘরে ঘরে আধ্যাত্মিকতাময় মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হই।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে ফাঁকির চাল।

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সমর্থন করিয়া আজকাল মুখে মুখে

অনেকেই বলেন,—"নিম্নবর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলে তাহাদিগকে চল করিয়া লইতে আমাদের আপত্তি নাই।" এইরূপ ফাকির চালবাজীর উত্তরে আমরা বলিতে চাই,—"সাহা, স্বর্ণ-বণিক, তিলি, ম'ঘেব্রাহ্মণ, ম'ঘেকায়স্থ ও পিরুলি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি এমন সব জাতি আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দু হইতে কোন অংশেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কম নন, বরং অনেক স্থানে তাঁহাদের পরিচ্ছন্নতা ও ধর্ম্মভাবই সমধিক প্রশংসনীয়। যদি অপরিষ্কারের জন্যই নিম্নবর্ণকে অচল করিয়া রাখা হইয়া থাকে, তবে কর্ত্তাদের নিজেদের চে'য়ে পরিষ্কার "সাহা ও স্বর্ণ-বণিক" প্রভৃতিকে অচল করিয়া রাখিয়াছেন কেন ? এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কেহ ম্লেচ্ছাচারী ও নিতান্ত নোংড়া (অপরিস্কৃত) হইলেও সমাজে চল ও গৌরবান্বিত কেন ? তাই বলি, ভ্রাতৃগণ ! এবার মিথ্যা কুসংস্কার-মূলক ফাকির চাল বাদ দিয়া ব্যাস ও পরাশরের পূজার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হউন, দেহে নূতন জীবনের স্পন্দন জাগিবে,— জাতীয় জীবনের সন্ধান মিলিবে।

উচ্চবর্ণের আবরণের ভিতরে সাম্যনীতির গন্ধ।

মানুষ মুখে মুখে যতই ফাকির-চাল চালিতে ও আবরণ দিতে চেষ্টা করুক না কেন মূলা খাইলে যেমন মূলার ঢেকুর

উঠে, তেমন প্রত্যেকের ভিতরের কথা ও সহজভাব প্রায় সময়ই কার্য্য-কলাপে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। নিম্নে উচ্চবর্ণের ভ্রাতাদিগের ঐ ভিতরের কথা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

১। একদিন আমার এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহার উকীল-ছেলের বিলাত-ফেরৎ উচ্চপদস্থ শ্যালক আসাতে খাওয়ার নানারূপ যোগার দেখিয়া সহাস্যে বন্ধুকে বলিলাম, আজ খানা-পিনার যেরূপ আয়োজন দেখিতেছি, তাহাতে বুঝি আ... শ্লোক আওরাইয়া হিন্দুয়ানি রক্ষা চলিবে না। বন্ধু উত্তর করিলেন, "ভাই তর্কে যাহাই বলি না কেন, কালের গতি রোধ করিবার উপায় কি? বৌমাকে তাঁহার পিত্রালয়ে না পাঠাইয়া পারি না, আবার তাঁহারা আসিলেও আদর যত্ন না করিলে চলে না, এখন ধর্ম্মটর্ম্ম সবই গেছে, আছে শুধু ধর্ম্মের খোলস্‌টা।" আমি বলিলাম—"ধর্ম্ম ত মরে নাই, ধর্ম্ম অমর। তোমরা লোকাচাররূপ বাহ্য খোলস্‌টাকেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার কর বলিয়া যত গোলমালের সৃষ্টি হয়। নিজের ঘরের ব্যাপারে চো'ক্‌ বুজিয়া নীরবে সব হজম কর, কাজেই এখানে জা'ত যাওয়ার ও ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ার কোন কথা উঠে না।" বন্ধু একটু হাসিলেন, এবং তাঁহার ছেলে ও কুটুম্বকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন,—"সমস্ত সংসারটাই এখন ঐভাবে গ্রাস করিয়াছে!"

২। আমার আর একটী গোঁড়া বন্ধুর বাড়ীর পার্শ্বে একটী অপ্রশস্ত জলাশয় আছে। ঐ জলাশয়ের অনতিদূরে

পায়খানা থাকাতে উহার জল সাধারণে প্রায়ই ব্যবহার করে না। একদিন আমার গোঁড়া বন্ধুকে ঐ জলে স্নান করিতে দেখিয়া বলিলাম, ছি ছি এই জল ব্যবহার করিলে! তোমার কি ঘৃণা নাই? বন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—গঙ্গায় কত মল ভাসিয়া যায়, তাতে কি গঙ্গা নষ্ট হয়? আমি বলিলাম,—এ তো শুধু গঙ্গা নয়, এখানে যে একসঙ্গে সপ্ততীর্থের সম্মিলন! বন্ধু বলিলেন,—যাই বল না কেন, 'মলে' আমার মোটেই ঘৃণা নাই, আমি নিজ হাতে মল ফেল্‌তে পারি, এবং আবশ্যক হ'লে ফে'লেও থাকি। আমি বলিলাম, 'মলে' ঘৃণা নাই, ঘৃণা বুঝি শুধু মল পরিষ্কারক মানুষে? বন্ধু উত্তর করিলেন, বাল্য সংস্কার কি সহজে যায়? আমি বলিলাম,—তোমার জাহাজের কেরাণী ছেলে যখন ঘরে আসে, রান্না ঘরে যায়, তখন তো বেশ সংস্কার মুক্ত উদার দেখ্‌তে পাই, তখন তো ছেলের ষ্টীমারে থাকার ও খাওয়ার কথা মনে আসে না? বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, সংস্কার অনেক দূর হয়েছে,—'শ্রীমানদের আচার-ব্যবহারের সংস্পর্শে।' আর দশ বৎসর যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে দেখিবে, আমরাও ঠিক ওদের মতই হইয়া গিয়াছি।

৩। এক সনাতনী গোঁড়া পণ্ডিত মহাশয় একদিন পাঁওরুটি কিনিয়া চলিয়াছেন, সম্মুখে আমাদের একটী সহধর্ম্মী ব্রাহ্মণবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ। বন্ধুটীকে দেখিয়াই পণ্ডিত মহাশয় একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—তোমরা সেদিন বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে ভূইমালি বাড়ীতে গিয়া না কি খাইয়াছ?

বন্ধুটী রসিকতার সহিত হাসিয়া উত্তর করিলেন, সেক্-স্রাদার্সের পা দিয়া প্রস্তুত পাওরুটি সমাজে চলে বলিয়া সেই বাড়ীর লোক দিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম—তোমরা লুচি প্রস্তুত করিবার সময় হাতে না ছানিয়া পা দিয়া ছানিয়া প্রস্তুত করিয়া দিও, তাহারা তাহাই করিয়াছিল। তৎপর কাচপাত্রের জল (লিমনেড-সোডা প্রভৃতি) সমাজে চলে বলিয়া তাহাদিগকে কাচপাত্রে করিয়া জল দিতে বলিয়া-ছিলাম, তাহারাও কাচপাত্রেই জল দিয়া ছিল। সেখানে আমরা যাহা খাইয়াছি, সে সবই তাহাদের দ্বারা ঐভাবে সমাজে প্রচলন-যোগ্য শোধন করিয়া লইয়াই খাইয়াছি, স্থতরাং উহাতে জাতি-যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বলা বাহুল্য বন্ধুটীর ঐ উপযুক্ত কৈফিয়তে এ পর্য্যন্তও তাহাকে কেহ সমাজে বন্ধ করিতে পারেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়—সমাজে আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের মত অনেকেই নিজের মূলার ঢেকুরের গন্ধ নিজে বড় পান না, অন্যের ঢেকুরের গন্ধ শুকিয়া লম্ফঝম্প করিয়া বেড়ান!

৪। একদিন ষ্টীমার যোগে ঢাকা যাইবার পথে দেখিলাম, ব্রাহ্মণ-ভদ্র প্রভৃতি উচ্চবর্ণের প্রায় সকলেই—এমন কি বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে নব্যা ভব্যা সেণ্ডেলমার্কা বিবিরা পর্য্যন্ত অবিচারে নিম্নবর্ণের হাতে দোকানে যা—তা খাইলেন! অনেকে বাবুর্চ্চির হাতের খানা খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন! ওসব খাইলেন না শুধু এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনকারী লেখকের মত দুই একজনে, এবং উক্ত

খানাপিনাকারী উচ্চবর্ণ যাহাদিগকে হেয় মনে করেন,—অস্পৃশ্য বলেন, সেই সাহা, তিলি, মালি ও নমশূদ্র প্রভৃতি ধর্ম্মভীরু লোক সকলে! ব্যবহারিক জগতে ঐভাবে সর্ব্বদা উচ্চবর্ণের ভিতরকার যে সাম্যনীতি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি, কপট ব্যবহারটা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা মনে মুখে এক হইলেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আর বিলম্ব হইবে না।

৫। সেদিন বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য-সঙ্ঘের গোঁড়া নেতারা শতকরা পচানব্বই জন হিন্দুর প্রতিনিধি সাজিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গোঁড়ামী, ছুঁৎমার্গ ও সনাতনী-গৌরব পাকা করিবার জন্য বিলাতে গিয়া সাহেব-গৌরাঙ্গ প্রভুদিগের মহাপ্রসাদে ধন্য হইবার সঙ্গে .সঙ্গে উহা যে সমুদ্র জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাদের ঐ সনাতনী হাড়ি যে এবার পৃথিবীর হাটে ভাঙ্গিয়া বিচূর্ণ হইয়া গেল, ইহা কি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এতকাল যাঁহারা সমুদ্রযাত্রীদিগকে জা'তনাশা বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিজের এই সমুদ্র যাত্রার ফলে দেশের লোকে তাঁহাদিগকেও জা'তনাশা বলিয়া বর্জ্জন করিবে না কি? পক্ষান্তরে কর্ত্তাদের বিলাত ঘুরিয়া আসাতে—সে দেশের অন্ন-জলে যদি তাঁহাদের সনাতনী-প্রভাব নষ্ট না হইয়া আরও পাকা হইয়া থাকে, তবে এপর্য্যন্ত যত বিলাত-ফেরৎ আসিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও যে জাতি যায় নাই, তাঁহারাও সকলেই যে সনাতনী,—অতঃপর স্বরাজ্য-সঙ্ঘ একথা মানিয়া লইবেন কি?

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে খাদ্য বিচার।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে ও শরীরের অবস্থানুসারে খাদ্য-বিচার সর্ব্বদা প্রয়োজন। অতএব অবিচারে যেখানে সেখানে যা, তা খাওয়া উচিত নয়। অবিচারে যা, তা খাওয়ার নাম অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নহে, উহা ব্যভিচার ও আত্মহত্যার পথ মাত্র। ব্যাধিগ্রস্তের হাতে ও অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নের হাতে আহার করা নিষেধ। ইহা ভিন্ন নানা জনের শরীরে নানা প্রকার কুৎসিত ও সাংঘাতিক ব্যাধি থাকা সম্ভব বলিয়া অজ্ঞাতকুলশীলের হাতেও আহার করা সঙ্গত নয়। যেখানে সেখানে যার তার হাতে খাইলে এক শরীরের ব্যাধি অন্য শরীরে সঞ্চারিত হয়, আত্মা মলিন হয়, এবং অনেক সময় অনভ্যস্ত উগ্রবীর্য্য ও বিষাক্ত খাদ্য খাইয়া নানা প্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি নীরোগ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রচিত্ত, এবং যাহাকে দেখিলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, তিনি যে জাতির লোকই হউন না কেন, তাঁহার হাতে আহারে কোন দোষ নাই।

এসম্বন্ধে মহর্ষি আপস্তম্ব তাঁহার ধর্ম্মসূত্রে প্রশ্ন করিতেছেন,—"ক অশ্যান্ন ?" অর্থাৎ কাহার অন্ন খাইবে ? "পুণ্যইতি কৌৎস্নঃ (৪।১৬।১৯ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র)।" কৌৎস্ন ঋষি উত্তর করিলেন, যিনি পুণ্যবান অর্থাৎ পবিত্র ও শুদ্ধাচারী তাঁহার অন্ন খাইবে। খাদ্য সম্বন্ধীয় এই নীতি ভুলিয়া যথেচ্ছাচারের সঙ্গে বর্ত্তমানে সকলে এক হুকায় তামাক খায়, হোটেলে ও চায়ের

দোকানে অবিচারে বহুলোকে একই উচ্ছিষ্টপাত্রে আহার করে! এইভাবে একের মুখের লালা ও ব্যাধির বীজ অন্যের শরীরে প্রবেশ করে! ইহা ভিন্ন রুটি, লুচি, মিঠাই, বিস্কুট, কেক্ প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ হাতে দলিত মথিত ও পিষ্টভাবে প্রস্তুত হয়, ঐ সব খাদ্যের ভিতর দিয়াও এক শরীরের ব্যাধির বীজ অন্যের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এই সমস্ত কারণে আজ দেশে নানা সাংঘাতিক ব্যাধির আক্রমণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে! সিফিলিসের বিষ প্রায় প্রতি দেহেই বর্ত্তমান! এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে শুধু বাংলা দেশের যক্ষ্মা রোগের মৃত্যু-সংখ্যা প্রদর্শিত হইল।—

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯১৬৬ জন লোক যক্ষ্মায় মারা গিয়াছে।
১৯২৯ " ১০৯৬৯ " " " " "
১৯৩০ " ১১৫৭৬ " " " " "

পাঠক মহাশয়! দেখুন, শুধু এক বাংলা দেশে যক্ষ্মার কি ভীষণ সংক্রামকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতিকে এই মরণের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে আহারে-বিহারে সংযত করা একান্ত প্রয়োজন। * আহারে সংযমতার নাম অস্পৃশ্যতা নহে। কোন ব্রাহ্মণও যদি অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত বা পাপাচারী হন, তবে

* আহার-বিহারে সংযত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে—"ব্যায়ামাত পশ্মারুতৈঃ"—(ব্যায়াম, সূর্য্যতাপ ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের দ্বারা) সর্ব্বব্যাধির প্রশমন হয়, এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

তাহার হাতেও কাহারও খাওয়া উচিত নহে। আবার শুদ্ধাচারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে কোন ব্যক্তির হাতে খাওয়াও স্বাস্থ্যজনক। এসম্বন্ধে মহর্ষি আপস্তম্ব বলিতেছেন,—"সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানানাং ভোক্তব্যম্।" অর্থাৎ স্বধর্ম্মেস্থিত সর্ব্ববর্ণের অন্নই গ্রহণকরা যায়। এখানে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ সম্বন্ধে কোন কথা নাই; অধার্ম্মিক, পাপাচারী ও অপরিচ্ছন্ন উচ্চবর্ণের অন্ন গ্রহণও নিষেধ, ইহাই ঋষিবাক্য। সুতরাং ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বদা সংযত আহার ও খাদ্যবিচার,—আত্মরক্ষা, এবং ব্যাধির সংক্রামকতা হইতে অব্যাহতির জন্য একান্ত কর্ত্তব্য

সকল প্রকার খাদ্যের ভিতর দিয়াই এক শরীর হইতে অন্য শরীরে ব্যাধির বীজ সঞ্চারিত হয়। এর মধ্যে দলিত, মথিত ও পিষ্টভাবে হাতে প্রস্তুত রুটি, লুচি ও মিঠাই হইতে গরম গরম ভাত অনেক নিরাপদ। কেননা চাল ধুইবার পরে উহাতে হাতের স্পর্শ মোটেই লাগে না। উপযুক্ত সিদ্ধ হওয়ার পরে মার ঝাড়িয়া ঐ গরম ভাত যখন হাতা দিয়াই তুলিয়া দেওয়া হয়, তখন গরম গরম ভাত ও গরম ডাল-তরকারী অন্যের পাক করা হইলেও পরিষ্কার ভোজনপাত্রে আহার করিলে উহাই সবচেয়ে নিরাপদ। সুতরাং যেখানে সেখানে রুটি, ও লুচির ভিতর দিয়া প্রস্তুত কারীর শরীরের ব্যাধির বীজ ও হাতের মালিন্য উদরস্থ না করিয়া নিরোগ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকের হাতের গরম গরম অন্ন-ব্যঞ্জন পরিষ্কার ভাবে আহার করাই স্বাস্থ্য ও তৃপ্তিজনক। আশা করি পাঠক মহাশয়

উক্ত মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা আহারের ব্যবস্থা করিবেন। একটা গোঁড়ামী লইয়া খাদ্যকে অখাদ্য এবং বিষকে অমৃত বোধে আত্মহত্যা করিবেন না।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের নিমিত্ত যিনি যত মত ও যত পথই আবিষ্কার করুন না কেন, কলি-পাবন অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের ভিতর দিয়া সাম্য-মৈত্রীময় মুক্তির পথ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ঐ পথ ভিন্ন সরল, সুন্দর ও সুপ্রশস্ত পথ আর দ্বিতীয় নাই। আমরা সকলকেই ঐ রাজপথ অবলম্বনে জাতীয় জীবন-গঠনে ব্রতী হইতে অনুরোধ করি। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ভিতরে যাঁহারা কোন মৌলিক-সত্য বা তত্ত্ব উপলব্ধি করেন না, আমরা তাঁহাদিগকে উহা উপলব্ধি করাইতে গিয়া এই কথা বলি,—জগৎ-পরিচালন ও সৃষ্টি-স্থিতি-সংরক্ষণের মূলে রহিয়াছে, শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ-শক্তির প্রেরণা ভিন্ন কোন কর্ম্মেরই আরম্ভ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটে না। এখনই যদি জগৎ হইতে "শব্দ" বাদ দেও, সঙ্গে সঙ্গে অমনি কর্ম্মদ্বারে অর্গল পড়িবে, পৃথিবী কর্ম্মহীন ও অচল হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব শব্দ ব্রহ্মের অমোঘ শক্তি প্রভাবেই যে জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

তোমাকে কোন একটি কথা বলিলে, তুমি হয়ত অমনই ঐ শব্দশক্তির উন্মাদনায় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিবে। কোন

শব্দ শোনামাত্রই তুমি হয়ত শোকে দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িবে। কোন শব্দে হয়ত হাসিয়াই অস্থির হইবে। কোন কোন শব্দে তুমি স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা ও ভক্তিতে তন্ময় হইবে। আবার কোন শব্দে তুমি মৃত্যুশয্যা হইতেও নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়া বসিবে! ভাই! প্রত্যেক শব্দেই যখন এইরূপ মহা মহা শক্তি নিহিত; আঃ! উঃ! প্রভৃতি অব্যয় শব্দেও যখন প্রাণ অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন শব্দ যে মহা-শক্তিময় ও ভাবময়, শব্দব্রহ্মই যে জগতের চালক ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ আছে কি? এখন কথা হইতেছে, সমস্ত শব্দেরই যদি শক্তি থাকে, সমস্ত শব্দই যদি ভাবের আধার হয়, তবে ভগবানের নামে যে আরও কি মহামহা ভাব-ভক্তি, ও শক্তি নিহিত, তাহা বলিয়া প্রকাশ করার বিষয় নয়, অনুভবের বিষয়মাত্র। এই শব্দব্রহ্ম লইয়াই হিন্দুর মন্ত্র-তন্ত্র ও সাধন-ভজন, মুসলমানের নামাজ, ও খৃষ্টানের প্রার্থনা। এই শব্দব্রহ্ম লইয়াই মহাপ্রভুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

এই শব্দব্রহ্মের অমোঘ শক্তিতেই মহাত্মা গান্ধী বিগত অনশনে একুশদিন রামনাম জপ করিয়া ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই শব্দ-ব্রহ্ম হ'তেই কাহারও 'ওঁকার' কাহারও নারায়ণ, কাহারও কৃষ্ণ, কাহারও হরি, কাহারও সীতারাম, কাহারও আল্লা, কাহারও যীশু, কাহারও গড্, কাহারও 'নিতাইগৌর-রাধেশ্যাম'। ঐ সমস্ত নামে সর্ব্বত্রই সাধন-ভজনের

মারফতে আত্মার উন্নয়ন বা উদ্ধার-বিধান হইতেছে। অতএব ভ্রাতৃগণ! মহাপ্রভুর হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যে একটা ফাকা কথা নয়, ইহা যে মহাভাবময়, ভক্তিময়, শক্তিময়, প্রেমময় ও রসময়, এই নাম সঙ্কীর্ত্তন যে সর্ব্ববর্ণের একী-করণ-অভিযানে জয় লাভের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র, ইহাতে যে, অস্পৃশ্যতা-মহা-পাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া জাতীয়-মুক্তিতে মহামঙ্গল বিধান করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব প্রার্থনা, সকলেই মহাপ্রভুর মহাপথ অবলম্বনে ও মহামন্ত্র-গ্রহণে জাতীয় ঐক্য-সাধনে ব্রতী হউন, নিবেদন ইতি।

মহাপ্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তনের আরও বিশেষত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু আভিজাত্যের গরিমা বিচূর্ণকরিয়া সকলের অবাধ সম্মিলনের জন্য অবিচারে সর্ব্ববর্ণের একত্রে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্র[illegible]ন করিয়াছিলেন। তখন হইতে সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দেওয়াটা পাশ হইয়া রহিয়াছে। ঐ পাশ-সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্তও যোগ দিতে পারে,—কার্য্যক্ষেত্রে উহা প্রত্যক্ষ ঘটিয়াও যাইতেছে।

সঙ্কীর্ত্তনে যেমন প্রাণখোলাভাবে সকলের সহিত সকলের মেশামিশি হয়, এমন কি কোলাকুলি ও গলাগলি পর্য্যন্ত হইয়া যায়, এমন মিলন আর কিছুতেই হয় না। অতএব মহাপ্রভুর পাশ করা ঐ সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞই যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের সর্ব্ব-প্রধান উপায় তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবানের নাম অশেষ শক্তি-সম্পন্ন। কিরূপে ঐ নাম-শক্তির ভিতর দিয়া ভগবৎ-শক্তি আসিয়া সাধকের মনে ও আত্মায় সঞ্চারিত হয়, এবং উহা অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের কতটা সাহায্যকারী, এখানে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিয়া উপসংহার করিব। ইহা অভ্রান্ত সত্য যে—

রাম, শ্যাম, যদু, ও মধু 'যেকোন নামীর সহিত তাহার নামের', এবং 'নামের সহিত ঐ নামীর' সম্বন্ধটা প্রাণবান হইয়া সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, যদি নামীর চৈতন্যের সহিত জ্ঞানের সংযোগ ঘটে। এইজন্য কেহ কাহারও নাম করিবামাত্র এ নামকারীর দিকে নামীর চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক,— যদি শব্দটী নামীর শ্রুতিগোচর হয়, এবং সে জ্ঞানের সহিত সচেতন থাকে। ভগবান পূর্ণ চৈতন্যময়, পূর্ণজ্ঞানময়, ও পূর্ণ-সর্ব্বজ্ঞ; তিনি সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বদা পূর্ণ জাগ্রত। সুতরাং যে কেহ ভগবানের যে কোন নাম উচ্চারণ করিলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায় ও সর্ব্ব-শ্রুতির মহিমায় উহা অমনি গিয়া তাঁহাতে পৌঁছিয়া নামকারীর দিকে ভগবৎ-ভাবধারাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। নাম-নামীর এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হইতেই ভগবৎ-ভাব বা অধ্যাত্ম-শক্তি ক্রমে ক্রমে সাধকের বা নাম-কারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তনে শব্দব্রহ্মের শক্তি ও ভগবৎ-শক্তি সঞ্চারিত হইতে হইতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকৃত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন অবশ্যম্ভাবী।

ভ্রাতৃগণ! মানুষের স্থূলদেহ চলে,—সূক্ষ্ম-আত্মা, সূক্ষ্ম-

মন, সূক্ষ্ম-গুণ ও সূক্ষ্ম-জ্ঞানের সূক্ষ্মতম শক্তিতে। ট্রামগাড়ী, মটরগাড়ী ও রেলগাড়ী বায়ুবেগে চলে,—তাড়িত ও বাষ্পের অদৃশ্য সূক্ষ্ম-শক্তিতে। সূক্ষ্মশক্তিই যখন স্থূল বিশ্বের পরিচালক ও কার্য্য-সম্পাদক, তখন ভগবানের ও তাঁহার নামের সূক্ষ্ম-শক্তিই যে আত্মার বিকাশ বা মনুষ্যত্ব লাভের মূল, এবং উহার প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশের মত মোহ ঘুচিলেই যে প্রকৃত অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্ভব, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।* আশা করি, সুধী-সমাজ মহাপ্রভুর নাম-যজ্ঞ বিষয়ক ঐ বর্ণনীয় বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

---

* ভগবানের চিন্ময় শক্তিই প্রতিজীবে আত্মারূপে বিরাজমান। এইজন্য আত্মার বিকাশ বা গঠন করিতে হইলে ভগবৎ-সাধনায় আত্মাকে তাঁহার আত্মীয়ের দিকে উন্মুখ করিয়া দিয়া ভগবৎ-ভাব-ধারায় প্রভাবান্বিত করা প্রয়োজন।

শেষ নিবেদন।

(নিম্নবর্ণের ভ্রাতাদিগের প্রতি)

ভ্রাতৃগণ! এপর্য্যন্ত যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, মূলে অস্পৃশ্যতা কোথাও নাই। অস্পৃশ্যতা আছে শুধু—'উচ্চবর্ণের মুখে, এবং ঐ ঘৃণিত আখ্যায় আখ্যাত তোমাদের মনে।' বংশাভিমানী উচ্চবর্ণ কথায়, কার্য্যে ও ব্যবহারে এতকাল ধরিয়া তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে,—'তোরা হীন, তোরা নীচ ও তোরা অস্পৃশ্য,—তোদের জল খাওয়া দূরে থা'ক ছায়া স্পর্শ করাও পাপ!' তোমরা তথাস্তু বলিয়া উহা মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইয়াছ, এবং অবিরাম মনে, মুখে ও কার্য্যে জপ, চিন্তা ও ধ করিতেছ,—'আমরা হীন ও নীচ, আমরা মানুষের অস্পৃশ্য, দেবতার অস্পৃশ্য, এবং ভগবানেরও অস্পৃশ্য,—আমাদের স্থান,—মনুষ্য সমাজের বাহিরে, ভগবান ও দেবতার রাজ্য হইতে অতি দূরে!!" নিজের প্রতি হীনতার এই সুদৃঢ় সংস্কারই হইতেছে,—প্রকৃত অস্পৃশ্যতা। উহাতেই মানুষকে বাস্তবিক আত্ম-বিস্মৃত করিয়া মনুষ্যত্বের গৌরব হইতে অতি নীচে,—নরকের শেষ নিম্নতম ধাপে নামাইয়া চি হীন ও নীচ করিয়া রাখে।

হে আমার শ্রদ্ধেয় ভাইসব! হে আমার প্রিয়তম ভাইসব! তোমরা কেহই নীচ নও, কেহই হীন নও, কেহই হেয় নও, এবং কেহই অস্পৃশ্য নও। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ যে বিশ্ব-পিতা ও বিশ্ব-মাতার সন্তান, তোমরাও সেই বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতারই সন্তান। তাঁহাদের ভিতরে যে চৈতন্যময় ভগবৎ-শক্তি আত্মারূপে বিরাজমান, তোমা ভিতরেও সেই ভগবৎ-শক্তিই আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ভিন্ন মনু যখন যাবতীয় মানবের আদি পুরুষ, তখন উচ্চবর্ণেরও তোমাদের সকলেরই যে একই পিতৃ-পুরুষ হইতে—একই বংশে জন্ম,

এবং একই গোত্র,-সকলেই যে পরস্পর ভাই ভাই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্য আবার বলি,—তোমরা হীন নও, অস্পৃশ্য নও, মূলে সকলেই এক। এই মৌলিক মহাসত্য ভুলিয়া, তোমরা আপনাদিগকে যে চিরহীন মনে করিয়া বসিয়া আছ; এবার ঐ মোহ দূর করিয়া জাগিয়া উঠিতে হইবে, মানুষ হইয়া প্রত্যেককে আপনার পায় দাঁড়াইতে হইবে।

ভাইসব! এবার উঠ, জাগ, চৈতন্য লাভ কর, স্বপ্রতিষ্ঠিত হও। মন ও মুখ এক করিয়া দৃঢ়তার সহিত বল,—দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান ও—"আমি মানুষ, আমি ভগবানের সন্তান,—অমৃতের সন্তান; আমাকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে, দেবত্বের ধাপে উন্নীত হইতে হইবে, অমৃতের অধিকারী হইতে হইবে; আমি শৃগাল-কুকুরের অধম নই, কীট-পতঙ্গের অধম নই, আমি বাস্তবিকই মানুষ, মনুষ্যত্ব, ঋষিত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভে আমার পূর্ণ অধিকার আছে, ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া আমাকে ব্যাস হইতে হইবে, বাল্মীকি হইতে হইবে, দেবর্ষি না হইয়া সশরীরে স্বর্গে—বৈকুণ্ঠে ও ব্রহ্মলোকে বিচরণ করিতে হইবে, কে আছ কোথায় আজ মিথ্যার আবরণ সম্মুখে ধরিয়া আমার গতিরোধ করিবে?"

ভাইসব! এই দৃঢ়তা লইয়া সংস্কারকামী ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের হাত ধরিয়া সংস্কার গ্রহণ কর। সত্য-ধর্ম্মের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার সহিত সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর ম সঙ্কীর্ত্তনে জীবন বিকাইয়া দেও; গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সর্ব্বত্র কীর্ত্তনের দল বাঁধ। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া সকলকে এক করিয়া লও, সকলের সহিত এক হইয়া যাও। কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কাহাকেও হীন ও নীচ ভাবিও না। সকলেই তোমার

ভাই, তুমিও সকলের ভাই, ভাই ভাই এক হও। হরিনাম মহা-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রেম-ভক্তির মহামহিমায় জগৎ-বাসীকে দেখাইয়া দেও,—

চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।

দেখাইয়া দেও মহাপ্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তনে অভিমানের পাহাড় বিচূর্ণ হইয়া যায়! ভাই! উঠ, জাগ, কর্ত্তব্যে ব্রতী হও, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখ,—"যার যার উন্নতির পথ তার তার নিজের হাতে; নিজের স্বর্গের সোপান নিজে রচনা না করিলে অন্যে করিয়া দিতে পারে না।

(উচ্চবর্ণের ভ্রাতাদিগের প্রতি)

আমার উচ্চবর্ণের ভ্রাতাদিগের নিকট শেষ নিবেদন এই,—উদারতা, মহাপ্রাণতা, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও গুণগ্রাহিতা লইয়া যুগধর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে। এযুগে অবিচার, গোঁড়ামী, একদেশদর্শিতা ও যুক্তিহীন মনগড়া শাস্ত্রের দোহাই যে টিকিবেনা, ইহার প্রমাণ,—বহু সংস্কারের বিরুদ্ধে আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিফল-চীৎকার। আপনাদের অন্ধ গোঁড়ামী ও কুট শাস্ত্র-বিচারের শতবাধাও যে স[illegible]হ প্রভৃতি সে সব কুপ্রথাকে জীবিত রাখিতে পারে নাই, যুগধর্ম্মের প্রভাবে আস্তে আস্তে সবই যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। ঐসব কুপ্রথা যেমন অদৃশ্য হইয়াছে, তেমন অস্পৃশ্যতাও যে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া জাতীয় জীবন গঠিত হইবে, ইহার গতিরোধ করিবে কে? যুগধর্ম্ম বিধাতার নিয়ন্ত্রিত, ইহার উপর মানুষের হাত নাই।

ভাইসব! যুগধর্ম্মের ঋষিগণ সমাজকে অনাচার ও অবিচারের দোষ-মুক্ত করিয়া নিরপেক্ষভাবে নূতন ছাঁচে গড়িবার জন্য আসিয়াছেন, আপনারা হয় ইহাদের সহযোগী বা অগ্রণী ভাবে কাজ করিয়া ইতি-হাসের বুকে স্বর্ণাক্ষরে নাম অঙ্কিত করিয়া চিরস্মরণীয় হউন, আর

না হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল চেষ্টায় যেমন ফণা ও বিষশূন্য ঢোঁড়াসাপ সাজিয়াছেন, সেই পথে চলিতে চলিতে ক্রমে ভবিষ্যৎ ভারতের চক্ষে কেঁচোতে পরিণত হউন,—যেমন খুসি। কিন্তু আমার শেষ নিবেদনে কর্ণপাত করিলে সত্বরই আপনাদিগকে মোহ-নিদ্রা হ'তে জাগ্রত হইয়া, সমাজের ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটিগুলির সংশোধনে নিজ নিজ গৌরব রক্ষা করা উচিত।

সমাজের উপর যে ভীষণ মর্ম্মান্তিক অত্যাচার সমূহ নির্ম্মম-ভাবে চলিয়া আসিতেছে! যে অবিচারকে হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত .রিয়া লইয়া চো'ক বুজিয়া ফুলের মালার মত গলায় পরিতেছেন! যাহার বিষময় ফলে হিন্দুজাতি অবিরাম ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে! আপনাদিগকে নিম্নলিখিত সেই অবিচারের বিচার করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

সমাজের প্রতি কয়েকটী নির্ম্মম অত্যাচার।

১। সমাজের নেতৃস্থানীয় পঞ্চাশ-ষা'ট বৎসর বয়স্ক পক্ককেশ বৃ. ,র্ত্তারা পর্য্যন্ত স্ত্রীবিয়োগে বা পত্নী বর্ত্তমানেও ইচ্ছামত বিবাহ করিয়া কাম-কামনা চরিতার্থ করেন! আর ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা পূর্ণ যুবতী কন্যা-ভগিনীদিগকে পতি-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে থানের কাপড় পরাইয়া অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া ও চুল কাটিয়া—আতপ-চা'ল, কাচকলা ও নির্জ্জলা একাদশী ঘাড়ে চাপাইয়া ব্রহ্মচারিণী সাজাইয়া থাকেন!! আমরা ব্রহ্মচর্য্যের ও সংযমের পক্ষপাতী বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ংযম কি শুধু বিধবাদেরই প্রয়োজন? না কি পুরুষদের এবং সধবা স্ত্রীলোকদেরও প্রয়োজন? যেভাবে জোর করিয়া কঠোর নিয়মের শাসনে নিঃসহায়া অবলাদিগকে যৌবনে যোগিনী সাজান হয়, উহার ভিতরে কি সংযম ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের লেশমাত্র থাকে? নাকি উহাতে

অতৃপ্ত বাসনার উপর নির্ম্মম পৈশাচিক অত্যাচারের মারফতে ব্রহ্ম-চর্য্যের মিথ্যা প্রলেপ দেওয়া হয় মাত্র !!

হায় ! যাঁহারা অতৃপ্ত-ভোগ-লালসায় অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা মাছ মাংস খাইতেন, শ্যামেজ-কামেজ ও আলতা পরিতেন, নানা মনোরম বসন-ভূষণে সাজিয়া গুজিয়া স্বামীসহ অফুরন্ত সুখের আস্বাদনে ভর-পূর থাকিতেন ! বৃদ্ধ কর্ত্তাদেরই মত যাঁহারা একবেলা মাছ না হ'লে হয়ত ভাত মুখে দিতে পারিতেন না ! যাঁহাদের সন্তান সন্ততি জন্মিতেছিল, অথবা যাঁহারা পুত্রবতী হওয়ার জন্য মাতৃভাবে গড়িয়া উঠিতেছিলেন ! সেই বিকাশোন্মুখ, ও ভোগ-সুখোন্মুখ অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় ভরা জীবনগুলিকে জোর করিয়া পিষিয়া মারিবার ব্যবস্থা কি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ? নাকি উহা অধর্ম্মের ও নির্য্যাতন-নীতির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা ? এই মহাপাপেই কি হিন্দুসমাজ ধ্বংসের পথে যাইতে বসে নাই ? এই অত্যাচারে ও মহাপাপের নরক-অভিনয়ে মর্ম্মাহত হইয়া মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অশ্রুপ্লাবিত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার ?
হ'য়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার,—
রমণী বধিছ পিশাচ হ'য়ে !
* * * * *
দেখ্‌রে দুর্ম্মতি যত, চির ম্লেচ্ছ-পদানত,—
বিধবার শাপে হায় এদুর্গতি হয় রে !!"

মহা-মানব দিগের ঐ মর্ম্মভেদী মহাবাণী ও পরম উদার শাস্ত্রের আদেশ কে শোনে ? বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অবাধে ভোগ করিয়াও যাঁহাদের নিবৃত্তি

ও সংযমের লেশমাত্র জন্মে না, পলিতকেশে, স্খলিত-দন্তেও যাঁহারা বালিকা স্ত্রী বিবাহ করিয়া ভোগবিলাসের রঙ্গরসে বিভোর হইয়া থাকেন, সেই সব কামের কুকুর ও কামুক পিশাচগণই উদার হিন্দুধর্ম্মের নিরপেক্ষ-বিধান ও বিদ্যাসাগর-প্রমুখ ত্যাগী-মনীষীদিগের বাণী, আদর্শ ও মহানুভবতা পদদলিত করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত—অপূর্ণ বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত তরুণী-দিগের প্রতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করেন!! যাঁহারা আপনাদের কাম-কলুষিত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পরের উপর সংযমের ব্যবস্থার অছিলায় ধৃষ্টতা ও পাশবিক অত্যাচার করিয়া বসেন, তাঁহাদের এ মোহান্ধতাময় নেতৃত্বে শত ধিক ! সহস্র ধিক সেই নির্লজ্জ ভণ্ডদিগের মন-গড়া শাস্ত্র-বিচারে ! ধিক তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতার গোঁড়ামীতে !

পরম উদার হিন্দুশাস্ত্রে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী নাই। উদার-শাস্ত্র সকলের জন্য এক মাপের জামা প্রস্তুত করেন নাই, যার গায় যেমনটী খাটে, তার জন্য তেমনটীর ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেকেরই শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্য সর্ব্বত্র ত্যাগীর জন্য ত্যাগের ও ভোগীর জন্য ভোগের ভিতর দিয়া মোক্ষ-লাভের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

প্রাক্তন-প্রভাবে যাঁহাদের প্রাণে ত্যাগ-বৈরাগ্য জাগিয়াছে, সংসারের ভোগ-বিলাস তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করিতে পারে না। প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে অগণিত মুনি-ঋষি ও তপস্বী ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। বর্ত্তমান যুগেও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, অরবিন্দ প্রভৃতি অগণিত মহাপুরুষ ত্যাগের মূর্ত্তিমান-বিগ্রহস্বরূপ বিরাজমান। স্ত্রীলোকের ভিতরেও ঐরূপ ত্যাগ-বৈরাগ্য-শালিনী তপস্বিনী ও ব্রহ্মচারিণী অনেক ছিলেন ও আছেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, মীরাবাই, এবং বর্ত্তমান যুগের * "শ্রীমা" প্রভৃতি উহার দৃষ্টান্ত স্থল।

---

* "শ্রীমা"—ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী

পুরুষই হউন, আর স্ত্রীলোকই হউন, প্রাক্তন-প্রভাবে যাঁহাদের বাসনা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা এই মায়াময়-সংসারে আসিয়া জলের উপরে তৈলের মত ভাসিয়া ভাসিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিছুতেই তাঁহাদিগকে ডুবাইতে পারে না; ডুবাইতে চেষ্টা করিলেও উপরেই ভাসিয়া উঠেন, এবং নির্লিপ্তভাবে জগৎকে আধ্যাত্মিক উন্নতির আদর্শ দেখাইয়া লক্ষ্য-পথে চলিয়া যান।

অন্যদিকে যাঁহাদের প্রাণে ঐরূপ ত্যাগ-বৈরাগ্য জন্মে নাই, তাঁহারা সংসার-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া বাসনা ক্ষয় করিতে করিতে আত্মিক-উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহাই উদার শাস্ত্রের বিভিন্ন মাপের জামা।

এখন কথা হচ্চে,—প্রাণের স্বরূপ না বুঝিয়া সকলের গায় একই মাপের জামা পরাইতে গেলে,—রোগ না বুঝিয়া ঔষধ দেওয়ার মত উহাতে বিকারের বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। এইজন্য ভিতরের অবস্থা না বুঝিয়া ত্যাগীকে ভোগী সাজাইতে গেলে, তত ক্ষতি হয় না, সে স্বীয়-স্বভাবেই তৈলের মত জলের উপরে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু ভোগীকে জোর করিয়া ত্যাগী সাজাইতে গেলে, তাহার ভিতরের পূর্ণ আসক্তি-বশতঃ গোপন-পাপ ও ব্যভিচারের সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এইজন্য,—

পরম উদার হিন্দুশাস্ত্রে একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণতামূলক ব্যবস্থা নাই। বেদ-পুরাণে সর্ব্বত্রই বিপত্নীক পুরুষদিগের পুনর্ব্বিবাহের মত পতিহীনা স্ত্রীলোকেরও পুনঃ পতি-গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এসম্বন্ধে মূল ধর্ম্ম-শাস্ত্র ঋগ্বেদ ১০।২।১৮।৮ সূক্তে বলেন,—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব॥

হে নারী! তুমি মৃত পতির নিকট শয়ন করিয়াছ, এখান হইতে উঠিয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া চল; যিনি তোমার হাত ধরিয়া তুলিতেছেন, তিনি তোমার পুনর্ব্বিবাহেচ্ছু পতি। বর্ত্তমানে তুমি তাঁহার পত্নী হও। অর্থাৎ হে নারী! তুমি মৃত পতির বিরহে তাঁহারই ধ্যানে জীবন্মৃত হইয়া জীবনকে মৃতবৎ-অসার করিয়া ফেলিয়াছ! এই জীবন্মৃত অসার অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সৃষ্ট উদ্দেশ্য-পূর্ণ কর্ম্মময় জীবনকে সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগ কর। যিনি তোমার অসার অবজ্ঞাত জীবনকে কর্ত্তব্যের পথে তুলিয়া লইয়া উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ করতঃ মনুষ্যত্বের ধাপে উন্নয়ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই মৃতদেহে জীবন-সঞ্চারকারী—যিনি তোমার জীবনের কর্ণধার হইতে ইচ্ছুক, তিনিই তোমার পতি। বর্ত্তমানে তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহার পত্নী হও।

বেদ ভিন্ন অন্যান্য বহুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেসব স্থান দেওয়া অসম্ভব। এখানে শুধু পরাশর সংহিতার টি উল্লেখ করা যাইতেছে যথা,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্ব নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

স্বামী,—নষ্ট, মৃত, পরিব্রাজক, ক্লীব, ও পতিত হইলে ঐ পাঁচ প্রকার অবস্থায় নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।

প্রাচীন হিন্দুসমাজ এমনই উদার ছিল যে, তখন বিধবা-বিবাহ তো দূরের কথা ক্ষেত্রজ পুত্র পর্য্যন্তও সমাজে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত ছিলেন। ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকিলেও আমরা এখানে সর্ব্বজন-বিদিত কয়েকটীর নাম প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি—

ক। যাঁহার সাধনা-প্রভাবে গঙ্গাদেবীর আবি সেই

স্বনামধন্য ভগীরথ বিধবার গর্ভজাত।

খ। যে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বংশধরগণের কাহিনী লইয়াই পুরাণ-শ্রেষ্ঠ মহাভারত; সেই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুনামক সর্ব্বজন পূজ্য শ্রেষ্ঠতম রাজাদ্বয় বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভজাত। ইহা ভিন্ন পুণ্য-শ্লোক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবও যে কুন্তীদেবীর ক্ষেত্রজ পুত্র ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

গ। যিনি গৌরাঙ্গ লীলায় ব্যাসাবতার বলিয়া পূজিত,—চৈতন্য-ভাগবত লেখক সেই মহাভাগবত বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিধবা নারায়ণীর গর্ভজাত।

ভ্রাতৃগণ! যে কয়েকটী স্বনামধন্য জগত-পূজ্য মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করা হইল, ইঁহাদের ন্যায় জাত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ সমাজের কাছে সম্মান পাওয়ার পরিবর্ত্তে জারজ-আখ্যায় অভিহিত হইয়া নিতান্ত-ঘৃণিত অস্পৃশ্য-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন না কি? বর্ত্তমান সমাজ ঐরূপ ব্যক্তির মুখ দেখাও মহাপাপ মনে করে না কি?

বর্ত্তমান হিন্দুজাতি প্রাচীন সমাজের উদার দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রের উদার-বাণী উপেক্ষা করাতে আজ সমাজে যে ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। হায়! ত্যাগ-বৈরাগ্যহীনা বিধবাগণ অসংযত সমাজের ভিতরে যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় ব্রহ্মচারিণীরূপে বাস করেন, তাহার কথঞ্চিৎ স্বরূপ-প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়,—

অদম্য পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ কাহারও সম্মুখে স্বর্ণপাত্রে সুশীতল জল রাখিয়া তাহাকে উহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলে যেরূপ ক্রমেই প্রাণান্তকর দারুণ তীব্রতর-আকাঙ্খার সৃষ্টি করিতে থাকে, প্রতি গৃহে অসংযমী স্ত্রী-পুরুষদিগের ভোগ-বিলাসের ও কামাচারের আদর্শের

ভিতরে অপূর্ণ-বাসনা-তাড়িতা বিধবাদিগের অবস্থানের ফলে ঠিক সেইরূপ আসক্তির অদম্য উদ্দীপনা জাগাইতে থাকে। এর পরে যখন রক্ষক-রূপী ভক্ষকগণ ঐ উদ্দীপ্ত বাসনারূপ আগুণে ঘৃতাহুতি দিতে অগ্রসর হয়, তখন অতি সহজেই অসহায়া অবলাগণ তাঁহাদের ছলা কলায় বিভ্রান্ত হইয়া বর্জ্জন-নীতির মহিমায় পতিতা নাম কিনিতে বাধ্য হইয়া থাকেন!

ভাইসব! সমাজের ভিতরে যখন বিধবা ব্যতীত আর কাহারও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও সংযমের ব্যবস্থা নাই, তখন অপূর্ণ বাসনায় উদ্বেলিত-হৃদয় * বিধবাদের উপর জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা না করিয়া যথাশাস্ত্র তাহাদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করাই যে,—গোপন-পাপ, ভ্রূণহত্যা ও পতিতার স্রোত রুদ্ধ করিবার ধর্ম্মানুমোদিত প্রকৃষ্ট পথ, এবং উহা হইতেই যে হিন্দুজাতির ক্ষয়ের পথরোধ করিয়া অস্তিত্বের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব সমাজ-পতিগণ! যুগধর্ম্মের নিরপেক্ষ সাম্যনীতি-প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হউন, অবিচারের অবসানে সমাজে প্রকৃত শান্তি-সুখের প্রতিষ্ঠা হ'ক।

দ্বিতীয়-অত্যাচার।

যে সমস্ত লম্পট-পুরুষ ছলাকলা দ্বারা কুল-ললনাগণকে পথভ্রষ্ট করিয়া ঘরের বাহির করতঃ হাটে-বাজারে ও অলিতে গলিতে

* দেশে চার পাঁচকোটী বিধবা বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে ১ বৎসর বয়স্কা হইতে ২০।২৫ বৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যাই বারআনা। ঐ অসহায়াদিগের কতক বৈষ্ণবী, কতক ঝি-চাকরাণী কতক উপপত্নী ও কতক পরের গলগ্রহ হইয়া দুঃখময় লাঞ্ছিত জীবন যাপন করেন। কতক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিত বাধ্য হন। সমাজের ব্যবস্থার দোষে প্রতিবৎসর কত যে হাজার হাজার ভ্রূণহত্যা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজ হ'তে সর্ব্বাগ্রে এই মহা পাপের অবসান জন্য বিধবা-বিবাহ প্রচলন আবশ্যক। যাহা শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের অনুমোদিত তাহাকে পাপ মনে করাতেই হিন্দু-সমাজ ধ্বংসের পথে গিয়াছে। সকলেই ঐ পাপ বর্জ্জন করিয়া হিন্দুজাতির মুখ উজ্জ্বল ও গৌরব বৃদ্ধি করুন।

পতিতারূপে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে, এবং যে সমস্ত কামুক-পিশাচ অবিরত ঐ পতিতাগণের সংসর্গ করিয়াও সগৌরবে প্রতিপত্তির সহিত সমাজে বসবাস করিতেছে! এই কোটী কোটী কামুক লম্পটের কেহই যখন পতিত ও অস্পৃশ্য নয়! শুধু কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিয়া পতিতা নাম কিনিয়াছেন,—নিরপরাধিনী অবলাগণ!! তখন ঐ এক চোঁকো সামাজিক অবিচারের ও অত্যাচারের কি প্রতিকার হওয়া আবশ্যক নয়? আজ বাস্তবিকই যদি সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত করিতে হয়, আজ বাস্তবিকই যদি মাতৃজাতিকে রক্ষা করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে কি ঐ বিপথকারী ও সংসর্গকারীদিগের পাতিত্যের সংশোধন আবশ্যক নয়? ঐ গৌরবান্বিত লম্পটদিগকে পতিতাগণ অপেক্ষাও অধিক অপরাধী এবং পতিত মনে করিয়া সামাজিক শাসনে উহাদের পৈশাচিক ব্যবহারের গতিরোধ করা কি একান্ত যুক্তি-যুক্ত নয়? যদি সমাজের ধুরন্ধরগণ ঐরূপ পতিত-গণের উপর কোন কথা বলিতে ও ব্যবস্থা করিতে না পারেন, এবং ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে যদি অনেক স্থলে নিজেদের উপরেই আঘাত আসিয়া পড়ে, তবে শুধু নিরাশ্রয়া দুর্ব্বলা অবলাগণকে সমাজ হ'তে পতিতা বলিয়া বিদায় না করিয়া সূত্রপাতেই ইহাদের সংশোধন করা, বা প্রতিকার অসম্ভব স্থলে পরস্পরের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কি একমাত্র কল্যাণজনক নহে? একমাত্র বিধবা বিবাহই যে ব্যভিচার ও পতিতার স্রোত রুদ্ধ করিবার প্রকৃষ্ট পথ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি এইরূপ কোন শান্তিপ্রদ সংশো... ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন না হয়, যদি ঐ পতিতার সংসর্গকারী গৌরবান্বিতগণের কেহই পতিত না হন, তবে ঐ একদেশদর্শী ব্যবস্থার ফলে, কুল-ললনাগণ যে অবিরাম-গতিতে ঐ সব প্রতারকদের দ্বারা বিপথগামিনী

হইয়া দেশের ও জাতির মুখে কলঙ্কের কালি মাখিতে থাকিবেন, ইহার গতিরোধ করিবে কে ?

হায়! যে কার্য্যের জন্য পুরুষের দুর্নাম, কলঙ্ক ও অপরাধ নাই, পুরুষদেরই প্রেরণায় সেই কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য কত যে গুণবতী, দয়াবতী, রূপ-লাবণ্যবতী ও ভক্তিমতি মাতার শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও মহৎ-জীবন পথের আবর্জ্জনার মত যেখানে সেখানে পদদলিত হইতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই !

আজ বর্ত্তমান সমাজ—নিতান্ত ঘৃণিতচরিত্র, মিথ্যাবাদী, চোর, জুয়াচোর, দস্যু, দুর্ব্বিনীত, পরপীড়ক, পিতৃমাতৃ-ঘাতী দেববিগ্রহে অশ্রদ্ধাকারী, কলহ-প্রিয় ও ভ্রষ্টাচারা পুরুষকে এবং ঐরূপ স্ত্রীলোককে শুধু একটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য করিয়া চরিত্র-হীন ও চরিত্র-হীনা বলিবে না, শ্বেতকেতুর সতীত্বের ব্যবস্থার পর হইতে সৎ ও সতীর সংজ্ঞা হইয়াছে ঐরূপ। আমরা অবশ্যই ঐ পাপের সমর্থন করি না, কিন্তু তাই বলিয়া শত সহস্র গুণের আকর হইয়াও যাহারা সামাজিক ব্যবস্থার দোষে বা ঘটনাচক্রে ঐরূপ পথে চালিত হইয়া পড়েন, তাঁহা-দিগকে পথের আবর্জ্জনার মত পদদলিত না করিয়া বরং ঐ ধুল্যবলুণ্ঠিত রত্নকে ধুইয়া মুছিয়া, শিরোভূষণ করিয়া লইতে সমাজের গুণগ্রাহিতার দাবী করিতেছি। উপসংহারে নেতাদিগকে একথাও স্মরণ করিতে বলি যে, বিধবা-বিবাহ যদি ভগবানের অনভিপ্রেত হইত, তবে বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সন্তান-উৎপাদিকা-শক্তিও নষ্ট হইয়া যাইত। তাহা যখন হয় না, তখন ভগবানের বিধানের উপরে কর্ত্তৃত্ব চালাইতে যাওয়াটা একান্তই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য, সন্দেহ নাই।

তৃতীয়-অত্যাচার।

একজন মহাপাপী নর-পিশাচ শত সহস্র অন্যায় কাজ করিয়াও

শুধু,—গলায় একগোছা সূতা-ঝুলান থাকার জোরে, বা কৌলীন্য-ব্যঞ্জক উপাধীর গৌরবে সমাজে পদ-মদভরে প্রাধান্য করিয়া বেড়াইবে,—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচ্চুরী, পরদার ও পর-পীড়ণ প্রভৃতি কোন কিছুর জন্যই সে হেয় বা অস্পৃশ্য হইবে না! আর একজন মহাপ্রাণ সত্ত্ব-গুণী-ব্যক্তি নানাগুণে বিভূষিত হইয়াও, অস্পৃশ্য, অচল ও হীন হইয়া মনুষ্য-সমাজের বাহিরে দীন-ভাবে মলিনমুখে কাল-যাপন করিবে,—কেহ তাঁহাকে মানুষ বলিয়াও গ্রাহ্য করিবে না! এই বৈষম্য ও অবিচারকে যুগধর্ম্ম প্রশ্রয় না দিয়া উহার উচ্ছেদ-সাধনেই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ঐ দেখিতেছ না যে,—আজ তোমার গোঁড়ামীপূর্ণ সমাজ-পতিত্বের অভিমান বিচূর্ণ করিয়া বিধর্ম্মী; খৃষ্টান ও মুসলমান পর্য্যন্ত আচার্য্য-গুরুর (শিক্ষাগুরুর) আসনে সমাসীন হইয়াছেন! যুগধর্ম্মের এই বিবর্ত্তন কি কেহ রোধ বা উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ? যুগধর্ম্ম তোমাদের সমস্ত অবিচার-মূলক সঙ্কীর্ণ-নীতিরই যখন ধ্বংস করিতেছে, তখন আমার নিবেদনে সারা দিয়া, প্রত্যেকে মানুষ-ঘৃণাকরারূপ মহাপাপ পরিত্যাগ করতঃ জাতীয়-জীবন-গঠনে বদ্ধপরিকর হউন, এযুগে নিজের বাটীতে দুধকলা, আর পরের পাতে ছাই, এই পৈশাচিক-নেতৃত্ব টিকিবে না, **চাই প্রেম! মৈত্রী!! সাম্য!!!**

সংস্কার-কামী ভ্রাতাদ্দিগের প্রতি নিবেদন।

ভ্রাতৃগণ! দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইলে, সমাজের নিকট আবেদন নিবেদন করিলে কোন ফল হইবেনা, আবেদন নিবেদন শুনিবে কে? শুনিবার কি কাণ আছে? হিন্দুসমাজ যেন মৃতপ্রায় অসার হইয়া গিয়াছে! সর্ব্বত্র রহিয়াছে যেন উদ্যমহীন জীবন্মৃত শব! ইহাদের নিকটে প্রতিকারের কান্না

না কাঁদিয়া যুগধর্ম্মের মৃতসঞ্জীবন মহামন্ত্রে আপনাদিগকে সমস্তের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। কর্ত্তব্যে হাত দিতে গেলে হয়ত কোন কোন শবের দাঁত সিট্‌কান বিকট মূর্ত্তিতে ও পচাগন্ধে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। কিন্তু উহাতে ভয়ের কিছু নাই, প্রাণহীনের বিকট ভীতিও নিশ্চয়ই প্রাণ-হীন জানিবেন। ভাইসব! আপনাদের মহাপ্রাণতা দিয়া মৃত-জাতির চৈতন্য সম্পাদনের জন্য আপনারা ভগবৎ-প্রেরিত। আপনারা আপনাদের সেই প্রেরণা দ্বারা ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ করুন, জগতে এমন কেহ নাই বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে।

কোন ব্যক্তির নিম্ন-অঙ্গ গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত অসার অকর্ম্মণ্য ও অপবিত্র হইলে উত্তমাঙ্গ নিরোগ থাকিলেও সে যেমন, দশের বাহিরে দুঃখময় ঘৃণিত জীবন লইয়া নিতান্ত হেয়ভাবে মৃতবৎ অবস্থান করে, আজ হিন্দুর সমাজ দেহের নিম্ন–অঙ্গ অগঠিত ও [illegible]বৎ পচিয়া গলিয়া অকর্ম্মন্য হওয়াতে হিন্দু-সমাজ জগতের কাছে সেইরূপ ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত হইয়া দুঃখ এবং লাঞ্ছনা ভোগকে চিরসম্বল করিয়া লইয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায়,—নিম্ন অঙ্গকে রোগ-মুক্ত করিয়া সমাজ-দেহের গঠন।

নিম্ন অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে পচা-গলা ও সবচেয়ে দূষিত ক্ষত-[illegible]ক্ত শুচি-সঙ্ঘ! মাহাত্মা গান্ধী উপযুক্ত বৈদ্য। তাঁহার চিকিৎসায় ঐ সর্ব্বপ্রধান মহাব্যাধির প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মাঝামাঝি রকমের যাবতীয় রোগ-বিকার সমূহ আপনা

আপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে। এইরূপে সমাজ-দেহ সুস্থ সবল ও পূর্ণাঙ্গ হইলে, হিন্দু—দশজনের মধ্যে একজন হইয়া জগতের দরবারে মানুষ বলিয়া গণ্য হইয়া যোগ্যস্থান পাইবে সন্দেহ নাই। অতএব সকলে মহাত্মাজীর ঐ ব্যবস্থার অনুকূল-চিকিৎসায় মুখ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৌণ-ব্যাধির প্রতিকারে যত্নবান হউন; মৃতদেহে প্রাণ আসিবে, শ্মশানে উঠিবে—আনন্দ-কল্লোল! নিদাঘে বহিবে মলয় হিল্লোল! ইতি! শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

সনাতন ধর্ম্মের নামে ধৃষ্টতা।

সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম নিত্যসত্য আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। সনাতন-ধর্ম্মে কোথাও অবিচার ও পশ্বাচারের সমর্থন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল কোন কোন ভ্রাতা আপনাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত নেতা বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া অনেক স্থানে সংস্কার-সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে টেবুল চেয়ার ছুড়িয়া ৬- প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না। অনেক স্থানে মহাত্মাজীর সংস্কার-প্রচেষ্টায় বাধাদিবার জন্য গাড়ীর সম্মুখে শুইয়া গতিরোধ করেন, এবং কোথাও বা আরও কিছু শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কাজ করিতে বিমুখ হন না। আমরা ঐরূপ ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ইহাকি হিন্দুধর্ম্ম? হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ-কার্য্যে জাতীয় আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতায় কলঙ্ক-আরোপ না করিতে তাঁহাদিগকে করপুটে অনুরোধ ও প্রার্থণা জানাইতেছি। গোঁড়ামী-বর্জ্জন ও ধর্ম্মের

প্রকৃত সূক্ষ্ম-আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে আত্ম-নিয়োগ দ্বারাই হিন্দু-ধর্ম্ম জগতে গৌরবান্বিত হইবে, ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

পরিশিষ্টে,—প্রশ্নোত্তর।

জটিলশর্ম্মা,—তোমার বইর পাণ্ডুলিপি সব প'ড়েছি। তোমরা যতই শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি দেও না কেন, ভগবান কর্ম্মফল-অনুসারে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ সৃষ্টি ক'রেছেন, সুতরাং উহা চিরদিন থাক্‌বেই,—ইহা যুক্তিতর্কের অতীত।

বিবেকদাস,—পৃথিবীতে ভগবান এক? না—দুই?

জটিল,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ভগবান এক।

বিবেক,—মানুষমাত্রেরই কর্ম্মফল আছে কি?

জটিল,—কর্ম্ম সকলেরই আছে, সুতরাং ফলভোগীও সকলেই।

বিবেক—কর্ম্মফলভোগী যখন সকলেই, তখন ভগবান পৃথিবীর আর সব মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুকেই পুরুষানুক্রমে অনন্তকাল কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ ক'রে দিয়ে সৃষ্টি ক'রেছেন, একথা কি যুক্তি সঙ্গত? আমরা সৃষ্টির বৈচিত্র্য বা বৈষম্য স্বীকার করি,—যেমন আপনার বাড়ীর পাঁচজন মানুষ—গুণে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে পাঁচ রকম; এই বৈষম্যই মানব—জগতময়। কিন্তু আমাদের হিন্দুজাতির

ভিতরে যে 'মার্কামারা চিরগণ্ডীবদ্ধ উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ আছে', ইহা ভগবানের সৃষ্ট নয়, এই সঙ্কীর্ণতার পাপ-গণ্ডী বা আত্ম-হত্যার ফাঁদ আমরা নিজেই গ'ড়ে তু'লেছি। আপনার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান পৃথক একজন স্বীকার ক'রতে হয়, কেননা তথায় এইরূপ কর্ম্মফলের বোঝা চাপান নাই।

আর এক কথা,—ভগবান যদি পাপ-পুণ্যের ফল-ভোগের জন্যই উচ্চ নীচের সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তবে পুণ্যফলে পরিপূর্ণ উচ্চবর্ণের অগণিত লোকইবা পুণ্যের পুরস্কারভোগ ফেলে অস্পৃশ্য মুসলমান ও খৃষ্টান হ'য়েছেন কেন? এবং নিম্নবর্ণের সাতশত অনার্য্য ও অগণিত জে'লেইবা পাপের শাস্তি না ভো'গে আদি-শূরের ও শঙ্করাচার্য্যের উন্নয়নে ব্রাহ্মণ হ'লেন কেন? আজ পর্য্যন্তও সর্ব্বদা কত উচ্চ ঘরের স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছায় প[illegible] ও পতিত হ'য়ে যাচ্ছেন, আবার কত নিম্নবর্ণও উচ্চবর্ণে [illegible] পড়ছেন, কে তার সংখ্যা রাখে? * জিজ্ঞাসা করি,—এসবস্থলে ইহারা ভগবানের ব্যবস্থিত কর্ম্মফল-ভোগটা অতিক্রম করলেন কেমন ক'রে?

জটিল শর্ম্মা,—সবই ভগবানের ইচ্ছা। যার যতদিন ভো[illegible]

বিবেকদাস,—সবই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন বর্ত্তম[illegible] যুগধর্ম্ম অনুসারে জাতীয় সংস্কারও ভগবানেরই ইচ্ছা জা'নবেন।

---

* শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বিবাহে 'ভরার মে'য়ে' ইহার কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত পাইবেন।

যাঁর মন ছোট, সেই ছোট, যাঁর মন বড় সেই বড়, ইহাই মানুষের ছোট বড় ; হিন্দুশাস্ত্র এই কথাই বলে।

জটিল,—আজ ওকথা থা'ক্, আর একটা কথা বলি,—বিধবার ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুসমাজের গৌরব। জাতির এই গৌরব নষ্ট ক'রে, আমূল পরিবর্ত্তন দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলতা স্থষ্টি করা কি ভাল ?

বিবেক,—পুরুষই হউন আর স্ত্রীলোকই হউন, যাঁরা ত্যাগ বৈরাগ্য-সম্পন্ন মুক্ত, অর্থাৎ যাঁ'দের বাসনা ক্ষয় হ'য়ে গিয়েছে, তাঁ'দের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা চিরদিনই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হ'য়ে, তাপসভাবে চ'ল্‌বেন। পক্ষান্তরে যাঁরা বাসনাবদ্ধ, যাঁরা সংযম রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বেন না,—ব্যভিচারের স্থষ্টি কর্‌বেন, তাঁদের সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রকারের ব্যবস্থা। সমাজে এক শ্রেণীর পুরুষ আছেন, তাঁরা বিধবা দেখ্‌লেই কাণ্ডারীহীন তরণী ... ক'রে নিজ নিজ ঘাটে বাঁধবার জন্য, দড়ি-কাছি পাকা'তে থাকেন! ইহাদের ঐ প্রচেষ্টায় গোপনে বা প্রকাশ্যে অনেক স্থানেই পরস্পরের মধ্যে উপ—উপসর্গযুক্ত পতি-পত্নীত্ব ঘ'টে গিয়ে থাকে, সমাজে আজ এর অভাব নেই, উহা একরূপ ...তির মধ্যেই গণ্য। আমরা ঢাকে-ঢোলে যথাশাস্ত্র ঐ স্ত্রী-...রুষদের মধ্য হ'তে উপ—উপসর্গটা বাদ দিতে বলি ; এবং বিধবা-মহলে যে চুলপে'ড়ে কাপড় ও গলার হার চল্‌তি আছে, ঐ পা'ড়টা একটু বড় ক'র্‌তে ও হারের সঙ্গে বালা টালা কিছু যোগ করতে বলি ; যা চল্‌তি আছে তাঁর আমূল পরিবর্ত্ত—

কর্‌তে বলি না। এই ভাবে বৈধ সম্বন্ধ স্থাপনে ভোগ-তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সংসার-ধর্ম্মের মহিমায় উভয় জীবনই কর্ত্তব্যের প্রেরণায় মহিমময় হ'য়ে উ'ঠ্‌বে, সন্দেহ নাই। সুতরাং বিধবা-বিবাহ প্রচলনে পবিত্রতার বিধান, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় পবিত্র-চেতাদেরই করণীয়-জীবন-ব্রত হওয়া উচিত।

সমাপ্ত